অপারেশন অরিন্দম

বাণী বসু

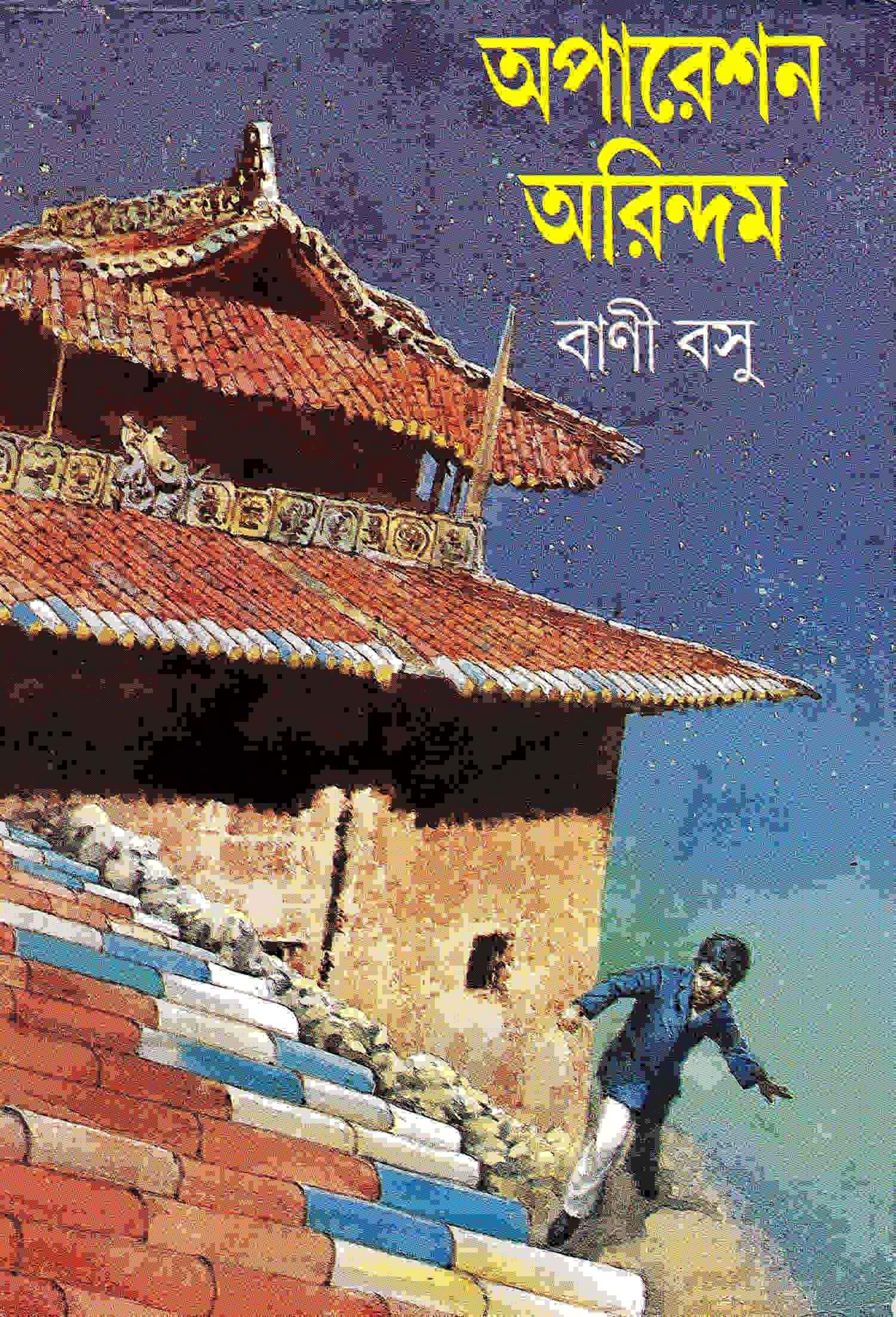

১/৪৯৯২
৯৫০৪

অরিন্দম

A.S.B

অক্টোবরের প্রথম শনি-রবিবার ওরা কাটিয়েছিল জিতের লোকাল গার্জেন মুকতার আলিসাহেবের বাড়ি, অর্থাৎ হোটেলে। 'ওরা' মানে সুনৃত বোস, পৃথ্বীশ রঙ্গচারী এবং অবশ্যই জিত রায়চৌধুরী। আলিসাহেবের একমাত্র মেয়ে শাহিনদি এসেছে। শাহিন-জামাইবাবুও খুব দিলদরিয়া লোক। সবাই মিলে লাল টিব্বায় দারুণ মজাদার পিকনিক করেছে শনিবার। বাস্কেটে দারুণ দারুণ জিভে-জল-আসা খাবার দিয়ে দিয়েছিলেন আলি-কাকিমা। খেতে খেতে দূর আকাশের বুকে সারি-সারি পাখি দেখা গেল। রঙ্গচারী তো মলয়ালাম না কন্নড় ভাষায় একখানা দু-পাতার কবিতাই লিখে ফেলল। রবিবার কেম্পটিতে স্নান করতে গিয়েছিল ওরা। এ-বছরের মতো শেষবার। কেম্পটিই এ চত্বরে একমাত্র প্রপাত যার জলে উলটে-পালটে মনের সুখে স্নান করা যায়। ক'দিন পরেই পুজোর ভিড় শুরু হয়ে যাবে। তখন স্থানীয় লোকেদের দমবন্ধ হয়ে আসবে এ-সব জায়গায়। মোটামুটি নির্জন থাকতে-থাকতেই তাই ওরা এবারের মতো মুসৌরি উপভোগ করে নিচ্ছিল। কারণ পুজোর পর মাস-দেড়েকের মধ্যেই পরীক্ষা, তারপরেই শীতের ছুটি।

সোমবার অ্যাসেমব্লির সময় ফাদার ঘোষণা করলেন, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, অদ্ভুত সংবাদটা। ওরা কেউ বিন্দুমাত্র টের পায়নি। সুনৃত, পৃথ্বীশ, জিত, কেউ না। অথচ, অরিন্দমের ঘর ওদের ঘর থেকে কতটুকুই বা! সরু দালানের এপার-ওপার। নাইন্‌থ ফর্মে উঠবার পর থেকেই ওদের এক-একটা আলাদা ঘর দেওয়া হয়েছে। ঘর নয় ঠিক কিউবিক্‌ল। ওরা বলে কিউব। একটা বড় হলকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ভাগ-ভাগ করা। প্রতিটি কিউবে একটা করে জানলা, তাকালেই দেখা যায় নীল পাহাড়, আর কালচে দেওদার আকাশের বুকে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। প্রথম যখন পাঁচ-ছ বছরের পুঁচকে পুঁচকে বীজকলাই ছিল তখন শুত বাঙ্কে। একজনের ওপর একজন। তারপর হল ডর্ম। সেই ডর্ম চলেছে একাদিক্রমে ছ'বছর। এখন প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ঘর। বৌদ্ধ

শ্রমণদের খুপরি-খুপরি সেলের মতো। খালি পাথরের তোশক-বালিশের জায়গায় রিল্যাক্সন। নইলে পৃথ্বীশদের বাবা-মা'রা রাগ করবেন। তাঁরা অতটা কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাস করেন না। ফাদার চান এইবার ছেলেরা আড্ডা কমাক। পড়াশোনায় মন বসাক। একা-একা থাকতে এবং ভাবতে শিখুক। নাইনে ওঠার পর প্রথম প্রার্থনা-সভার শেষে, তাদের আলাদা করে নিয়ে ফাদার বলেছিলেন সে-কথা। "বয়েজ, এতদিন সমবয়সী, বড় এবং ছোটদের সঙ্গে মিলে-মিশে কীভাবে থাকতে হয় শিখেছ, টিম-স্পিরিট যাকে বলে, আশা করি তোমরা তা আয়ত্ত করতে পেরে গেছ। কিন্তু শুধু নিজেকে নিয়ে থাকবার শিক্ষাও একটা মস্ত জরুরি শিক্ষা। আশা করি, একাকিত্বকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় তোমরা তা এবার শিখে নেবে।"

রুটিনমাফিক প্রেয়ার হল। সোমবারের জন্য নির্দিষ্ট হিম্ 'প্রেইজ দাই লর্ড ইন হাই হেভ্ন, প্রেইজ হিম্ প্রেইজ হিম...।' হঠাৎই যেন খুব অস্বস্তিকর ভাবে থেমে গেল সব। খুব গম্ভীরভাবে প্রায় শোকসংবাদ ঘোষণা করার ভঙ্গিতে ফাদার জোনাথন বললেন, "কাল রাত থেকে পাওয়া যাচ্ছে না অরিন্দম চোপরাকে। আসলে রাত থেকে না দুপুর থেকে তা-ও তাঁর সঠিক জানা নেই। লাঞ্চের সময় সে রিপোর্ট করেছিল, কিন্তু তারপর থেকে তার গতিবিধির খবর কেউ জানে না। এ-স্কুলের ইতিহাসে এরকম ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। নাইনথ্ ফর্ম থেকেই এখানে ছেলেদের খানিকটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ঘুরেফিরে বেড়াবার, ইচ্ছেমতো রাতের খাবার একা-একা খেয়ে নেবার স্বাধীনতা। পরীক্ষার পড়া করতে করতে রাত হয়ে যায়। সাড়ে-সাতটায় খেয়ে আটটা সাড়ে-আটটায় ঘুমিয়ে পড়া সম্ভব নয়। বিকেলের খেলাধুলোতেও তাদের এখন থেকে অতটা বাধ্যবাধকতা থাকে না।

গত সাতাশ বছরের ইতিহাসে ছেলেদের এইভাবে স্বাধীনতা দিয়ে ফাদার জোনাথন ঠকেননি কোনওদিন। সোমবার সকালে রোল-কলের সময় অরিন্দমের অনুপস্থিতি ধরা পড়ে। ওর কিউবে গিয়ে দেখা যায়, বিছানা নিভাঁজ। অতঃপর ওর নিজের ফর্মের ছেলেদের কাছে খোঁজাখুঁজি। কেউ কিচ্ছু জানে না। অস্বাভাবিক নয়। নিজের ফর্মের ছেলেদের সঙ্গে অরিন্দম কমই মিশত। ওদের মতে অরিন্দম হামবাগ, কিছুটা খ্যাপাও। আর অরিন্দমের মতে ওরা ছেলেমানুষ।

লাঞ্চ-ব্রেকের সময় ফাদারের ঘরে তিন মূর্তির ডাক পড়ল। এটা ওরা অনেক আগে থেকেই আশঙ্কা করেছিল। চোপরা ওদের থেকে এক ক্লাস উঁচুতে পড়লেও ওদের সঙ্গেই তার ঘনিষ্ঠতা সবচেয়ে বেশি, বরাবর। একমাত্র ওরাই জানে চোপরা খ্যাপা তো নয়ই, উন্নাসিকও না। আসলে ছেলেটা ভাবুক, নিল্স বোরের মতো, আইনস্টাইনের মতো ভাবুক। ওই বয়সের ছেলেদের তুলনায় ও অনেক বেশি পরিণত। ওর ভাবনা-চিন্তা, আগ্রহের বিষয়বস্তুগুলো সম্পূর্ণ অন্য জাতের। তাই চোপরা অনেকদিন ধরেই ওদের অবিসংবাদিত নেতা, যদিও ওরা কেউ হিরো-ওয়ারশিপে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না।

ফাদার এমনিতে খুব শান্ত, সমাহিত। চট করে রাগেন না। মুষড়ে পড়েন না। কিন্তু আজ ওরা ঘরে ঢুকেই লক্ষ করল—তাঁর ফর্সা, লালচে মুখে যেন কালির ছোপ পড়েছে। কপালে অনেকগুলো ভাঁজ। ধবধবে সাদা। ওদের বসতে বলে ওদের এবং নিজের লাঞ্চ তাঁর ঘরেই আনাবার নির্দেশ দিলেন তিনি হোস্টেলের কুক ভাণ্ডারীকে।

"রাঙ্গাচারি, রয়চাউড্রি, বোসো," প্রত্যেকের দিকে আলাদা করে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা এ-বিষয়ে কে কী জানো কিছু গোপন না করে আমাকে বলবে। তোমাদের কোনও শাস্তির আশঙ্কা নেই। আশা করি বয়েজ, আমার অবস্থাটা তোমরা বুঝতে পারছ। পুলিশকে জানানো হয়েছে, তারা যথাসাধ্য করছে, কিন্তু মিঃ চোপ্রাকে আমি কী কৈফিয়ত দেব ?"

ওরা মাথা নিচু করল। সারা ভারতের শিল্পপতি, ফরেন সার্ভিসের ডিপ্লোম্যাট, বড়-বড় সরকারি চাকুরে, কাজের খাতিরে যাঁদের যখন-তখন পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়াতে হয়, তাঁদের ছেলেরাই পড়ে গ্রিন হিল কনজারভেটরিতে। ভ্রাম্যমাণ বাবা-মায়েদের সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত রাখাই স্কুলের মুখ্য উদ্দেশ্য। কীভাবে আজ থেকে সাতাশ বছর আগে স্কটিশ প্রেজবিটারিয়ান চার্চের সদস্য ফাদার জোনাথন, উত্তর প্রদেশের বিজনেস-ম্যাগনেট হরকিষণ চোপরার সাহায্যে একটা সামান্য পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিক্ষার স্কুলকে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন, হরকিষণ চোপরাজি এ-স্কুলের জন্য কত লক্ষ টাকার ডোনেশন জোগাড় করেছিলেন, নিজেও কত লক্ষ টাকা ব্যক্তিগতভাবে খয়রাতি করেছিলেন, সেসব কথা ফাদার জোনাথনের মুখে ওরা বেশ কয়েকবারই শুনেছে। দুঃখের বিষয়, এই চোপরাজির একমাত্র ছেলে, অর্থাৎ অরিন্দমের বাবা এবং মা প্লেন অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। তখন থেকেই অরিন্দম ফাদার জোনাথনের কাছেই একরকম মানুষ। বিজনেস দেখেন অরিন্দমের জ্ঞাতিকাকা জগজিৎ চোপরা। ঠাকুর্দা কয়েক বছর আগে মারা যাওয়ার পরে অরিন্দমের অভিভাবক এখন কাকা এবং এই ফাদার জোনাথন। কাজেই ফাদারের দুশ্চিন্তা

হবে বইকি। কিন্তু সত্যিই অরিন্দমের এই অন্তর্ধানের মাথামুণ্ডু ওরা কিছুই জানে না।

জিত সাহস করে বলল, "ইদানীং ওর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ কমে আসছিল ফাদার। ও আজকাল একলা থাকতে ভালবাসত। আমরা ভাবতাম, সিলেকশন এসে গেছে, তাই।"

ফাদার বললেন, "শেষ ওকে কে কী ভাবে দেখেছিলে ?"

অনেক চিন্তা করে পৃথ্বীশ বলল, "শুক্রবার রাতে আমাদের ল্যাব থেকে ওকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি। এত অন্যমনস্ক ছিল যে, আমার সঙ্গে কোনও কথাই বলেনি।"

"রাত তখন ক'টা ?"

"সাতটা হবে হয়তো, এগ্‌জ্যাক্ট টাইম বলতে পারছি না।"

সুনৃত বলল, "ইয়েস, মনে পড়েছে। আমরা হোস্টেলে ফিরছিলুম। আমি আর জিত। ও 'হুইস্পারিং উইন্ডো'র সামনে রাইট অ্যাক্রস দা রোড বসে বসে একটা বাজনার তালে তাল দিচ্ছিল। রেস্তোরাঁটা থেকেই ভেসে আসছিল বাজনাটা। এটাও শুক্রবার রাতেই।

"তারপর আমরা শনিবার ভোরবেলা আলিকাকার ওখানে চলে গেলাম। আপনি তো জানেন ফাদার।"

আরও কিছুক্ষণ জেরা করে বিমর্ষমুখে ওদের ছেড়ে দিলেন ফাদার। ডিটেকটিভগিরি করতে হবে এ-কথা তো কোনওদিন ভাবেননি, শুধু স্কুল চালাতেই শিখেছেন তিনি। বললেন, "খোঁজাখুঁজির ব্যাপারে তোমরা যদি কোনওভাবে সাহায্য করতে পারো, দি স্কুল অথরিটি উইল বি গ্রেটফুল টু ইউ। তোমাদের চলাফেরার পূর্ণ স্বাধীনতা আমি দিচ্ছি। আশা করি, মিস্‌ইউজ করবে না। নিজেরা অসাবধান হবে না কোনওমতেই।"

তিনজনকে তিনটে লিখিত পার্মিশন উনি খসখস করে লিখে দিলেন সঙ্গে-সঙ্গে।

॥ দুই ॥

"আচ্ছা ঝামেলা পাকালে তো চোপরাটা !" সুনৃত বলল।

জিতের ঘরে জড়ো হয়েছে সকলে।

"এরকম একটা কিছু যে হতে যাচ্ছে, আমি কিন্তু তা আগেই আঁচ করেছিলাম।" পৃথ্বীশ বলল।

"তুই তো সব সময়েই আগে থেকে সব কিছু আঁচ করতে পারিস।"

"উঁহু, ঠাট্টা নয়। ইদানীং প্রায়ই বলত, 'আয়্যাম গোয়িং টু বাঙ্ক। পরীক্ষাগুলো তরে গেলেই চোপরা অ্যান্ড চোপরার ডিরেকটরগিরি কপালে নাচছে আমার। ডিস্‌গাস্‌টিং !' তো, আমি বলতাম, 'সে কী রে ! প্রিন্সের গদি তৈয়ার, আর এমন বোকা প্রিন্স যে বসতেই চাইছে না। বিজনেসও কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস !' ও বলত, 'তুই বোস্ গে না যা। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বনবাদাড় ঢুঁড়ে জ্যান্ত বাঁদর আর গোরস্থান খুঁড়ে মরা হাড় চালান দিবি, সেই সঙ্গে কুনো ব্যাঙের ঠ্যাং, আর আরশোলার মগজ।"

জিত বলল, "রাইট। এইখানেই ওর আসল আপত্তি। ও সায়েন্টিস্ট হতে চায়। পুরোপুরি গবেষণায় নিয়োগ করতে চায় ওর সমস্ত টাকা। এদিকে ওর চাচা সেই বিদ্‌ঘুটে এক্সপোর্টের লোভ ছাড়বেন না। বাংলার গ্রাম থেকে সঙ-বার্ড ধরে ধরেও নাকি চালান দেন। লক্ষ-লক্ষ মার্কিন ডলার কামান।"

"তা নিজে যা খুশি করুন না। অরিটাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টানাটানি করেন কেন ?" সুনৃত বলল।

জানিস না। অরির আঠারো বছর বয়স হলেই ওর প্রাইভেট লিমিটেড কম্পানি নিয়ে ও যা-খুশি করতে পারে। কারও গার্জেনি তখন খাটবে না। ঠাকুর্দার উইলের শর্ত এমনি কড়া যে, জগজিৎ চোপরার আর দাঁত ফোটাবার সাধ্য থাকবে না। কিন্তু ভদ্রলোক অরিকে ভালও তো বাসেন খুব। যখনই আসেন খুব শান্তভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন। অরি যা চায় দিতে কার্পণ্য করেন না। নিজের ছেলে নেই তো !"

পৃথ্বীশ বলল, "অরির যে ধরনের ব্রেন, সেটাকে বিজ্ঞানের কাজে না লাগিয়ে ফরেন এক্সচেঞ্জ কামানোর কাজে জুতে দেবার চেষ্টা করাটা কী ধরনের ভালবাসা আমি বুঝি না ভাই। গত সেশনে পলিউশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে ও কীভাবে ন্যাচারাল সায়েন্স থেকে সাইকোলজিতে চলে গেল, খেয়াল করেছিলি ?"

জিত বলল, "অবশ্যই করেছিলুম। আই. এস. সি.'র গিধ্‌ধড়গুলো ওকে হাততালি দিয়ে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলে মিঃ রড্‌রিগস্ উলটো-পালটা বকে ওকে বাঁচালেন বটে, আমার কিন্তু ধারণা, শেষ করতে দিলে ওর স্পিচটা দুর্দান্ত হত। সামথিং লুমিনাসলি অরিজিন্যাল। আরেকটা জিনিস জানবি, এমন কোনও বিজ্ঞানী নেই যাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার নিয়ে তাঁর নিজের প্রোফেশনের লোকেরা পর্যন্ত হাসাহাসি করতে ছাড়েনি। পাস্তুর-পাউসেটের কথা মনে কর। চিন্তা কর,

ইরেন কুরি-জোলিও কুরি যখন তাঁদের একটা পেপারে নিউক্লিয়ার ফিশনের কথা বলেছিলেন, অটো-হানের মতো বিজ্ঞানী পর্যন্ত সেটাকে আমল দেননি।"

রঙ্গচারী বলল, "যদ্দুর মনে আছে, ও বলছিল, জৈব-অজৈব যৌগের ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যাওয়া আবহাওয়া-দূষণ নিয়ে আমরা এত চিন্তিত। কিন্তু মানুষের ইভ্ল থট্‌স আরও সূক্ষ্ম উপায়ে এবং আরও ভয়াবহভাবে পৃথিবীর আবহ দূষিত করে চলেছে। এর ফলে জন্মাবে অপূর্ণ শিশু, যে-কোনও মানুষ যে-কোনও মুহূর্তে জঘন্য ক্রাইম করে বসবে, খাদ্যের ফুড-ভ্যালু কমে যাবে।"

সুনৃত বলল, "বুঝলাম। কিন্তু প্রমাণ কই ?"

জিত বলল, "প্রমাণের কথাতে ও আসছিল ভাই। বলছিল, এ জিনিস প্রমাণ করে দেখাতে গেলে অন্তত এক বছর সময় চাই, ওর স্যাম্পলগুলো দীর্ঘদিন ধরে ওয়াচ করতে হবে। অন্যান্য ফ্যাক্টর এলিমিনেট করতে হবে। ব্যয়সাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তা ছাড়াও জিনিসটা হয়তো জাস্ট একটা হাঞ্চ, এখনও আইডিয়ার স্তরে আছে।"

তিনজনেই খুব চিন্তিত হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। মুসৌরির উত্তুঙ্গ আকাশে সূর্য তখনও অস্ত যায়নি। আকাশের নীল আর পাহাড়ের গাঢ় সবুজ শেষবেলার গোলাপি আলোর সঙ্গে মিশে কেমন একটা গভীর বেগুনি রঙ ধরছে। জিত হঠাৎ বলল, "জানিস, অরি একবার আমায় বলেছিল, যে-কোনও মানুষভর্তি জায়গাতে গেলেই ও নাকি কতকগুলো ভাইব্রেশন টের পায়। ভাল-মন্দ নানারকম। সবাই বলবে গাঁজাখুরি। আমি কিন্তু বলতে পারি না। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। গত বছর সামারে অরির কাকা এসে আমার কিউবে বসে ছিলেন অনেকক্ষণ। আমি জানতামও না। রাত্তিরে কিছুতেই ঘুমোতে পারি না, কী প্রচণ্ড অস্বস্তি। যেন চারদিক থেকে কিছু আমাকে ধাক্কা মারছে। পরদিন ভাণ্ডারীর কাছে শুনলুম, অরি ছিল না, আমার কিউবটা খোলা ছিল বলে ওখানেই নাকি ওরা বসিয়েছিল চাচাজিকে। এটাকে কী বলবি, বল্ ?"

॥ তিন ॥

ম্যালের সমান্তরাল গ্র্যানাইটের তৈরি এই কালচে পাথুরে খাঁজটার নাম ক্যামেল্‌স ব্যাক। শোনা যায়, হিমালয় নাকি বহু লক্ষ বছর আগে টেথিস নামে বিশাল এক সাগরে নিমজ্জিত ছিল। ক্রমাগত পার্শ্বচাপের ফলে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত পাললিক শিলাস্তর ভাঁজ খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠে আসতে থাকে। এইসব অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি, কোটি, কোটি; ভাঁজের মধ্যে ছোট্ট একটা ভাঁজ ক্যামেল্‌স ব্যাক। ঠিক যেন মরুঝড়ের আশঙ্কায় হাঁটু মুড়ে বালিতে মুখ গুঁজেছে একটা অতিকায় উট। কুঁজসুদ্ধ পিঠটা খালি জেগে। খুব ভোরে একটা মস্ত কালো ঘোড়ার সওয়ার এক ব্যক্তি এই ক্যামেল্‌স ব্যাক থেকে বাইনোকুলার ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চতুর্দিকে দেখছিল। সওয়ারের নাম তিস্তা মুখার্জি। নাম শুনলে অনেকেই চোখ কপালে তুলবে। হ্যাঁ, সেই তিস্তা মুখার্জিই। রাইফেল শ্যুটিং, ফ্লাইং, সাঁতার—এই তিনটি বিষয়ে দক্ষতা দেখাবার জন্যে যে এই আঠারো বছর বয়সেই ভারতবিখ্যাত। তিস্তার কালো ঘোড়া দুলকি চালে চলতে লাগল। দুই বন্ধুর সঙ্গে মাত্র গত পরশু তিস্তা ছুটি কাটাতে এসেছে মুসৌরি। উঠেছে লাইব্রেরি বাজারের কাছে একটি ভারী ছিমছাম হোটেলে। হোটেলমালিক মুকতার আলি গুজরাটি মুসলমান। ছুটিতে তাঁর মেয়ে শাহিন, জামাই আনোয়ার এবং পুঁচকে নাতি মুফদ্দর ওরফে মুফিও এসেছে। ভারী আদর-যত্ন করেন এঁরা সবাই, ঠিক বাড়ির মতো। ক'দিনেই শাহিন, আনোয়ার আর বেগম আলির সঙ্গে ওদের দারুণ জমে গেছে। গতকাল, অর্থাৎ সোমবার বিকেল থেকে এই মুড়কির মতো একফোঁটা মুফিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবারই প্রথমে মনে হয়েছিল চঞ্চল বাচ্চা, টলতে টলতে হয়তো বাইরে চলে গেছে।

ওয়েসাইড হোটেলের দোতলার বারান্দা আর রাস্তা একই লেভেলে। এখানে সর্বত্র এরকম। রাস্তায় বেরিয়ে ও হয়তো গড়ানো পথে সামলাতে পারেনি নিজেকে, খাদে-টাদে পড়ে যেতে পারে। দু'বছরের তো বাচ্চা। হোটেলের কাছাকাছি খাদগুলো আঁতিপাঁতি খুঁজেছে তিস্তা। এখন ওরা তিন বন্ধু তিন দিকে খোঁজাখুঁজি করছে। স্প্রিং রোড ধরে মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনের দিকে চলে গেছে দূর্বাদি, ল্যাণ্ডর বাজারের দিকে গেছে র‍্যাচেল। মাঝামাঝি জায়গাটার ভার নিয়েছে ও। খাদের তলাগুলো রোদ উঠলে ভাল করে দেখতে হবে। যদি গড়াতে গড়াতে গিয়ে ঝোপেঝাড়ে আটকে গিয়ে থাকে, কাটা-ছেঁড়া ছাড়া মারাত্মক ক্ষতি হয়তো কিছু হবে না। কারণ, এইসব খাদ খুব ধীরে ধীরে ঢালু হয়েছে।

সবুজ ঘাসের জাজিমে আপাদমস্তক ছাওয়া, থেকে-থেকেই গাছপালা, ঝোপঝাড়। অত্যন্ত পরিষ্কার। সর্বদাই দেখা যাবে স্থানীয় পাহাড়িরা পিঠে লম্বা ঝুড়ি বেঁধে কাঠিকুটি পাতাটাতা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তার ওপর তুলতুলে বেড়ালছানার মতো এত্তটুকুনি তো শরীর।

বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখে-দেখে ওরা নিশ্চিন্ত হতে চাইছে, ছেলেটা কোথাও

আটকে নেই। র‍্যাচেলের অবশ্য গোড়া থেকেই ধারণা, এটা ছেলেধরার কাজ। মুকতার আলিসাহেব কিন্তু বারেবারেই বলছেন, গাড়োয়ালিরা অত্যন্ত সরল এবং সৎ। একটা বাচ্চাকে এভাবে ধরে কার কী লাভ ? মুফির মা বেচারি শাহিন কেঁদে-কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। আনোয়ারভাই যাকে বলে বড়লোকের নাদুস ছেলে, সে ভ্যাবলা মেরে রয়েছে। মুসৌরি-পুলিশের ওপর ওদের তিন বন্ধুর কোনও আস্থা নেই। দূর্বাদিই বলেছে, "দেখেছিস কীরকম বোকা-বোকা চেহারা।" সুতরাং কাউকে কিছু না বলে ওরা নিজেদের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে ও দূর্বাদি আর র‍্যাচেল। র‍্যাচেল বলছে র‍্যানসমের চিঠি এল বলে।

অনেক খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে অবশেষে তিস্তা ওয়েসাইড হোটেলের পথ ধরল। ওর ব্রোঞ্জ রঙের কপালে ভাঁজ। বাদামি চোখের মণিতে দুশ্চিন্তা, রাগ। কোন্ প্রাণে কোন্ দুশমন ওইটুকু বাচ্চাকে ধরে ? মুফির হারিয়ে যাওয়ার জন্য ওরা নিজেরাও কিছুটা দায়ী। প্রায় সমবয়সী কিছু মেয়ে পেয়ে খুব আড্ডায় জমে গিয়েছিল। ওর শ্বশুরবাড়ি খুব রক্ষণশীল তো ! ও এদিকে কলকাতায় প্র্যাটে পড়েছে, র‍্যাচেলেরও স্কুল ওটা। তিস্তারা সেদিন ওর কাছ থেকে একটা স্পেশাল মাংস রান্না শিখছিল। হাড়-হাড় দেখে মাংস দিয়ে কাঠকয়লার আঁচে করতে হবে। নো পেঁয়াজ। শুধু রসুন। দারুণ হয় নাকি খেতে। বদলে দূর্বাদিও ওদের পূর্ববঙ্গের মোচার পাতুরি, নারকোল-চিঁড়ে ইত্যাদি হাঁকছিল। মাঝখান থেকে মা দিদিমার অমনোযোগে ঘটে গেল ব্যাপারটা।

ম্যাল রোড যেখানে গান্ধী চৌকের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে একটা বিশ্রাম করবার গোলঘর আছে। তিস্তা দেখল দুটো বাদামি ঘোড়া নিয়ে বসে আছে ওদের ঘোড়াওয়ালা দত্তরাম। অর্থাৎ দূর্বাদি আর র‍্যাচেলও ফিরে এসেছে। কী হল, কে জানে !

হোটেলের মুখের কাছেই দূর্বাদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিস্তা বলল, "কিছু পেলে ?"

"না। কিন্তু একটা ইন্‌টারেস্টিং ব্যাপার ঘটেছে। ক্লুও বলতে পারিস। চল্ দেখবি।"

ব্যাস, এইটুকু বলেই দূর্বা মুখে কুলুপ এঁটে দিল। তিস্তা ওর এ-স্বভাব ভাল করেই জানে বলে চাপাচাপি করল না। হোটেলে ওদের ঘরের সামনে চমৎকার ঢাকা বারান্দা। বাইরে খাদ। স্টিলের ফিতের মতো পাক খেতে খেতে নেমে গেছে দেরাদুন-মুসৌরি রোড। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে থোকা-থোকা গ্রাম। তিস্তা দেখল র‍্যাচেল সোনালি চুলে একটা টপ-নট বেঁধে ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করছে। টেবিলে-বসা তিনটি অচেনা ছেলে। তিনজনেরই পরনে সাদা শর্টস। সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি, গেঞ্জির বুকে কী যেন মনোগ্রাম করা।

আলিসাহেব বললেন, "এসো তিস্তা, এদের কথাই তোমাদের বলছিলুম। পৃথ্বীশ রঙ্গচারী, জিত রায়চৌধুরী, সুনৃত বোস, এরা তিনজন আর ফোর্থ অরিন্দম চোপরা মিলে আমার বেসমেণ্টে ওই ল্যাবরেটরিটা বানিয়েছে। ফিফ্‌টিন টু সিক্সটিন এদের বয়স। অরিন্দম বোধহয় স্লাইটলি ওল্ডার। ধারণা করতে পারবে না, কী ম্যাচিওর চোখা ছেলে সব !"

তিস্তা বলল, "ভেরি ইন্‌টাররেস্টিং। তোমরা তো সকলেই গ্রিন হিলের ছাত্র শুনলাম। হোস্টেলে থাকো। কীভাবে এটা ম্যানেজ করলে ?"

জিত রায়চৌধুরী বলল, "কীভাবে আর ? আলিকাকাকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। আমাদের ফ্যামিলি-ফ্রেণ্ড উনি, আমার লোকাল গার্জেনও। ওঁকে খুব ধরে পড়াতে উনি ওই পোর্শনটা আমাদের ছেড়ে দিলেন। ফিনান্স করেছে অলমোস্ট পুরোপুরি চোপ্‌রা। কিন্তু তিস্তাদি, দা স্যাড থিং ইজ চোপরা সিম্‌স্ টু বি মিসিং সিন্‌স সানডে।"

দূর্বা বলল, "এইটাই ইন্‌টারেস্টিং ব্যাপার, তোকে বলছিলাম। এই চোপরা ছেলেটি চোপরা অ্যাণ্ড চোপরা ইণ্টারন্যাশানালের একমাত্র উত্তরাধিকারী। বাবা, কাকা, মা তিনজনেরই বিপুল সম্পত্তির ওয়ারিশ। আর আমাদের মুফিয়ার ঠাকুর্দা গান্ধীনগরের কটন্ কিং। এবার দু'য়ে দু'য়ে চার করো। র‍্যাচেল ইজ আফট্রল রাইট।"

পৃথ্বীশ রঙ্গচারী শুধু একবার মৃদুস্বরে বলল, "চোপরা কিন্তু সহজে কিডন্যাপ হবার পাত্র নয়।"

র‍্যাচেল, দূর্বা ওর কথা পাত্তার মধ্যেই আনল না।

কিন্তু প্রত্যাশিত মুক্তিপণের চিঠি পরবর্তী তিনদিনের মধ্যেও এল না।

॥ চার ॥

ম্যাল রোড জুড়ে ভুটিয়ারা আজ তাদের মরসুমি মালপত্তর নিয়ে বসেছে। রঙ-বেরঙের গরম পোশাক আর পাথরের মালার ঝকমকানিতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। টুরিস্ট সমাগম আরম্ভ হয়েছে, জমজমাট মুসৌরি। এটা-ওটা দর করছিল তিন বন্ধু। তিস্তা কিনবে উইণ্ড চিটার, র‍্যাচেল রঙিন পাথর, দূর্বা খুঁজছে ভাল দেখে একটা সাদা কার্ডিগান। ওর কালো রঙে নাকি সাদাই সবচেয়ে খোলতাই

হয়, নয় তো খুনখারাপি-লাল। তিস্তা নিচু গলায় বলল, "দূর্বাদি, এটা মনে হচ্ছে মুসৌরির বাঙালি সিজন। কত রঙ-বেরঙের বাঙালি ছেলে-মেয়ে নিয়ে হাওয়া বদলাতে এসেছে দ্যাখো! এই ফুটফুটে ছেলে-মেয়েগুলোর দু-চারটে যদি হাওয়া হয়ে যায়!"

'অলুক্ষুনে কথা বলিসনি," দূর্বা বিরক্ত হয়ে বলল। তা সত্ত্বেও তিস্তা ছোট্ট বাচ্চাসমেত একটি দম্পতির কাছাকাছি জিনিস পরখ করার ছলে এগিয়ে গিয়ে বলল, "বাচ্চা সামলে রাখবেন। মুসৌরিতে এ-সিজনে ছেলেধরার উপদ্রব শুরু হয়েছে।"

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন, ভদ্রমহিলা ভয়ের চোটে বছর-তিনেকের ফুটফুটে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিলেন। বললেন, "সর্বনাশ, কলকাতাতেও ছেলেধরা, কানপুরেও ছেলেধরা, আবার বলছেন এখানেও? আমরা তবে যাই কোথায় বলুন তো?"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো? ভীষণ চেনা-চেনা মনে হচ্ছে!"

তিস্তা বলল, "আপনিও কলকাতার লোক, আমিও কলকাতার লোক। দেখে থাকবেন বাসে-ট্রামে।"

ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে বললেন, "কানপুরে আমার মাসির নাতিকে এখনও পাওয়া যায়নি। শহর তোলপাড় করে ফেলেছে পুলিশ। আর কলকাতায় তো নিত্য এই খবর হয়েছে। তবে বেশির ভাগই যাচ্ছে ধনী লোকের ছেলেরা। সিন্ধি, পার্শি। মোটা-মোটা টাকা হাঁকতে হবে তো!"

ভদ্রমহিলা বললেন, "আপনার ছবি আমি কাগজে দেখেছি মনে হচ্ছে।"

তিস্তা সংক্ষেপে 'সাবধানে থাকুন' বলে সরে এল। দূর্বা ওকে ধমক লাগাল, "খামোখা বেচারিদের বেড়ানোটা নষ্ট করলি তো!"

"সাবধানের মার নেই। স্বীকার করবে তো দূর্বাদি?"

"মারেরও কিন্তু সাবধান নেই। যতক্ষণ না কিছু ঘটছে আমাদের কী করার আছে বল?"

পাহাড়ের ওপর থাক-কাটা সিঁড়ি বেয়ে ক্যামেল্'স ব্যাকে চড়ল ওরা। অন্ধকার হয়ে এসেছে। জিন্সের ওপর গরম পুলোভার, উলের টুপি চাপিয়েছে ওরা। র‍্যাচেল মাথায় একটা পাতলা উলের শাল জড়িয়েছে। রাস্তা অনেকটা। এবড়ো-খেবড়ো। কুলরি-বাজার ওদের গন্তব্য। কিছু সওদা করবে ঠিক আছে। কিন্তু যেভাবে রাত হয়ে যাচ্ছে তাতে করে দোকানবাজার খোলা থাকলে হয়।

র‍্যাচেল প্রথম দিকটা বেশ খুশমেজাজে ছিল। খোলা গলায় গাইছিল, "ডোণ্ট স্টপ টিল ইউ গেট এনাফ।" হঠাৎ চুপ করে গিয়ে বলল, "এত রাস্তা থাকতে এইরকম একটা গড-ফরসেক্ন্ রাস্তায় উঠলে কেন দূর্বাদি এই সন্ধেবেলায়?"

তিস্তা জবাব দিল, "যে-কোনও শহরের নাইনটি পার্সেন্ট ক্রাইমই এইরকম গড্-ফরসেক্ন্ অঞ্চলে হয় র‍্যাচেল।"

অন্ধকারের মধ্যে র‍্যাচেল মিডফোর্ড একটু শিউরে উঠল। এদের তিনজনের মধ্যে ওই সবচেয়ে ভিতু। আর্মচেয়ারে শুয়ে-শুয়ে ক্রাইম-নভেলের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে মাইক্রফ্ট হোমসের কায়দায় একটার পর একটা থিয়োরি দিয়ে যেতে পারে অনায়াসেই। কিন্তু কিছু কাজ করতে গেলে যে তাগদ আর নার্ভ চাই তা ওর নেই।

কোয়ালিটির সামনে ওরা যখন পৌঁছল তখন বেশকিছু দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেলেও সিজন বলেই কয়েকটা দোকানের ঝাঁপ খোলা। একচিলতে একটা ঘড়ির দোকানে ওরা ঢুকল। র‍্যাচেল চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল, "এত জিনিস থাকতে ঘড়ি কেন হঠাৎ?"

দূর্বা উত্তর দিল, "তিনজনে যদি তিনটে বিদেশী ঘড়ি এই কাউণ্টার থেকে ফাঁকতালে পেয়ে যাই, মন্দ কী?"

ও ভাঙল না সকালে ওরা তন্নতন্ন করে কুলরিবাজার ঘেঁটে গেছে। এই দোকানটার ব্যাপারস্যাপার খুব সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। প্রথমত কাউণ্টারে একজন শিখ যুবক এবং একটি বয়স্ক চিনা। দ্বিতীয়ত, তিন ঘণ্টার মধ্যে দোকানে কোনও কেনাবেচা হয়নি। কিছু লোক শুধু দোকানটার মধ্যে এসেছে আর গেছে, হয় শিখ নয় চিনা। বড় অদ্ভুত যোগাযোগ! এই লোকগুলি কাউণ্টারে মাথা নামিয়ে গভীর শলাপরামর্শ করেছে বলে ওদের ধারণা। একবারও শো-কেস থেকে একটাও ঘড়ি বার হয়নি। তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, ছোট্ট একপাটি পিচ-রঙের মোজার মতো কিছু-একটা তিস্তা এই দোকানের সিঁড়ির পাশে পড়ে থাকতে দেখেছে সকালে। যে মুহূর্তে ও জিনিসটা সংগ্রহ করবার জন্য দোকানটার দিকে পা বাড়িয়েছিল, ঠিক তখনই বিপুলকায় এক চিনা মহিলা বিশাল একটা পাতার ঝাঁটা দিয়ে দোকানের ধাপ্ এবং নীচের যাবতীয় জিনিস ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলে যায়। পিচ-রঙের একটা পুরো উলের স্যুট পরেই মুফি উধাও হয়। জিনিসটা বিদেশী, খুব পাতলা অথচ গরম। অনেকবার ওরা জিনিসটার প্রশংসা করেছিল বলেই ভাল করে মনে আছে। র‍্যাচেলকে ওরা এত কথা ভেঙে বলেনি। বিপদের সময় ওর উপস্থিতবুদ্ধি ভালই খোলে, কিন্তু

বিপদের কথা আগে থেকে চিন্তা করতে দিলেই সর্বনাশ।

দোকানে ঢুকে ওরা খুব আড়ম্বরের সঙ্গে ঘড়ি দেখা শুরু করল। সান-ট্রেক নামে সুন্দর একটা ঘড়ি শিখটি দমাস করে মেঝেতে আছড়ে ফেলে বলল, "দেখিয়ে মেমসাব, গিরলে ভি টুটে না, বালটিভর পানিতে ছেড়ে ভি রাখুন, খারাপ হোবে না, বহুত আচ্ছা চিজ আছে।"

"টিসো পাওয়া যাবে না ? কিম্বা ওমেগা ?" দূর্বা বলল।

"ওসব চিজ এখানে মিলবে না, স্মাগল্ড চিজের কারবার নেই হমাদের," দূর্বার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শিখটি বলল। এই সময়ে দূর্বা পায়ে কেড্‌সের ঠোক্কর খেল, তিনজনেরই কান খাড়া। খুব দূর থেকে একটা শিশুর কান্নার আওয়াজ আসছে না। তিস্তা হঠাৎ দুম্ করে বলল, "টয়লেট আছে আপনাদের দোকানে ?"

"জরুর," শিখটি বলল।

চিনেম্যান মাথা নেড়ে বলল, "নো প্রবলেম মিস, ইউ গো থ্রু দিস দোল, অ্যান্দ্ তার্ন রাইত। মাই ওয়াইফ উইল তেল ইউ।" তিস্তা এত তাড়াতাড়ি চিনে লোকটির খুলে-ধরা সবুজ দরজার ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল যে, বাকি দু'জন হতভম্ব।

অন্ধকার প্যাসেজটা। ডান দিকে ঘুরতে সামান্য আলো পেল তিস্তা। একটা অপ্রশস্ত চাতাল। একটি অসম্ভব মোটা চিনে মহিলা সেখানে টুলের ওপর বসে আগুনে পাত্র বসিয়ে চিনে গন্ধওলা কী একটা খাদ্যবস্তু নাড়াচাড়া করছে। তিস্তার অনুরোধে একটা দরজা দেখিয়ে দিল। ভাঙাচোরা হলেও টয়লেটটা পরিষ্কার। দরজাটা নড়বড় করছে। তিস্তা ঢুকেই হুড়কো লাগিয়ে দিল। উলটো দিকের দেওয়ালে উঁচুতে একটা স্কাইলাইট। কমোডের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে স্কাইলাইট দিয়ে বাইরে তাকাল তিস্তা। প্যাসেজটায় বোধহয় জিরো পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে। উলটো দিকে দুটো ঘর, একটা বাইরে থেকে ছিটকিনি দেওয়া। পাশেরটায় ওর দিকে পেছন ফিরে দুই সুবেশ ভদ্রলোক মাথা নামিয়ে নিচু গলায় কথা বলছেন। খুব স্পষ্টভাবে এবার ভেসে এল শিশুকণ্ঠের কান্না। তিস্তার মনে হল, বাচ্চাটা বলছে—'মাম্‌মি-ই-ই।' দুই ভদ্রলোকের একজন উঠে এসে খুব ব্যস্ত হয়ে এদিকে তাকিয়ে কী যেন বললেন। মোটা চিনে মহিলা সঙ্গে-সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াল বন্ধ দরজাটার সামনে। প্রচণ্ড কৌতূহলে তিস্তা স্কাইলাইট দিয়ে মাথাটা প্রায় গলিয়ে দিয়েছে এমন সময় ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড ভারী, ভোঁতা একটা কিছুর ধাক্কা লাগল। ও আর কিচ্ছু জানে না।

॥ পাঁচ ॥

নিত্যকার মতো ওরা দৌড়তে বেরিয়েছে। পৃথ্বীশ, জিত আর সুনৃত। এখন কিছুদিন খেলাধুলো বন্ধ আছে। সকালবেলায় এই ব্যায়ামটুকু না করলে শরীর ঠিক থাকবে না, গেম্‌স-টিচার বারবার বলেছেন। কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। সূর্য এখনও সে-কুয়াশা ভেদ করতে পারেনি। হুইসপারিং উইন্‌ডোর সামনে এসে পাথরের একটা চাঁইয়ের ওপর বসল তিনজনে। সুনৃত বলল, "এইখানটায় বসে ও বাজনার তালে তাল দিচ্ছিল।"

জিত্ বলল, "খুব মেজাজে। যেন নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর হয়ে আছে। আমাদের খেয়ালই করল না। সুরটা কী বল তো ? ওয়েস্টার্ন মিউজিক, কিন্তু কী ? খুব মন-মাতানো এইটুকু মনে আছে।"

সুনৃত বলল, "উঁহু। ঠকে গেছিস। মোটেই ওয়েস্টার্ন মিউজিক নয়। তবে সুরটা পাশ্চাত্য ঘেঁষা। রবীন্দ্রসঙ্গীত 'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো।' ডি-সুজা মাঝেমধ্যেই রবীন্দ্রসঙ্গীত অর্কেস্ট্রায় তোলে। ম্যাণ্ডোলিন আর বঙ্গো দুটো যা বাজছিল না, সিম্‌প্‌লি ওয়াণ্ডারফুল ?"

পৃথ্বীশ বলল, "তার একটু আগেই আমি ওকে আনমনা ভাবে ল্যাবরেটরি থেকে বেরোতে দেখেছি।"

"নিশ্চয়ই ল্যাবে ও যা করছিল তার সঙ্গে এই ফুর্তির যোগ আছে। দোলে মন দোলে অকারণ পুলকে," জিত্ বলল।

"সুতরাং ক্লুর জন্য আমাদের ল্যাবেই যাওয়া উচিত। দৌড়তে-দৌড়তে ওরা তিব্বতি রেস্তোরাঁ শিগাৎসির সামনে থমকে গেল। রাস্তার তলায় রেস্তোরাঁটা। খোলা পোর্টিকোয় সিনিয়র চোপরা অর্থাৎ অরিন্দমের কাকা খুব মন দিয়ে কিছু-একটা পড়ছেন। ক'দিন পরেই পুজো। এ-সময়টা ওদের চার-পাঁচদিন ছুটি থাকে। এত কম সময়ের জন্যে কেউই বাড়ি যায় না। কারও-কারও বাড়ির লোক ক'টা দিন এসে ছেলেকে সঙ্গে করে কোনও হোটেলে কাটিয়ে যান। চোপরা সাধারণত আসেন না। অরিন্দম স্কুল-বোর্ডিংয়েই ফাদার জোনাথনের হেফাজতে থাকে। এই সময়ে ওঁকে এখানে দেখে তিন বন্ধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। দ্রুত উলটো দিকের পাকদণ্ডী বেয়ে নীচে নেমে গেল তিনজনে। খানিকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে নামবার পর সুনৃত বলল, "সর্বনাশের মাথায় পা। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই কি সন্ধে হতে হবে ? সাতজন্মে উনি পুজোয় আসেন না, আর ঠিক এবারেই ওঁর আসা চাই ?"

জিত বলল, "ফাদার জোনাথন না হার্ট ফেল করেন । বেচারি বুড়ো মানুষ । পুলিশ তো শত খোঁজাখুঁজিতেও কিছু করতে পারছে না ।"

রঙ্গচারি বলল, "অরিন্দমের মতো রিসোর্সফুল ছেলে যদি নিজেকে লুকিয়ে রাখবে মনে করে তো কার সাধ্য বলো এই মুসৌরি টাউনে তাকে খুঁজে বার করে । দ্যাখো, হয়তো টেহরি গাড়োয়ালের কোনও পাহাড়ি গ্রামে গিয়ে বসে আছে ।"

সুনৃত ক্ষোভের সঙ্গে বলল, "কিন্তু আমাদের সঙ্গেও তো যোগাযোগ রাখবে । আমরা তো ওকে বিট্রে করতে যাচ্ছি না । যাই বলিস, অরি কিন্তু কাজটা ঠিক করেনি ।"

এই সময় দু'জন ষণ্ডামার্কা লামা ওদের পাশ দিয়ে হনহন করে নেমে গেল । খানিকটা দূরে চলে যাওয়ার পরে জিত বলল, "এই লামা দু'জন সারাক্ষণ আমাদের পেছন-পেছন এসেছে । এখন মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই । কী ব্যাপার বল্ তো ? এত ফোর-স্টার থ্রি-স্টার হোটেল থাকতে শিগাৎসিতে আঙ্কল চোপরা ! এদিকে লামারা আমাদের ওপর গুপ্তচরগিরি করছে । অরিন্দম ওঁর হাত থেকে পিছলে যাচ্ছে টের পেয়ে নিজেই নিজের ভাইপোকে কিড্‌ন্যাপ করেননি তো ভদ্রলোক ?"

ল্যাবে যখন ওরা এসে পৌঁছল তখন রোদ উঠে গেছে । তালা খুলে ঢুকতে যাবে, আলিকাকা উসকোখুসকো চুলে এসে বললেন, "সর্বনাশ হয়েছে জিত । ওই তিনটি বোর্ডার—তিস্তা, র‍্যাচেল আর দূর্বা কাল ফেরেনি ।"

"বলেন কী ? আপনি কখন জানতে পারলেন ?"

"রাত্তিরে জানতে পারিনি । এটা আমার দিক থেকে মস্ত একটা গাফিলতি বলতে পারো । অভিভাবকহীন তিনটি মেয়ে । আমার নজর রাখা উচিত ছিল । কিন্তু এখন ট্যুরিস্ট সিজন আরম্ভ হয়ে গেছে । তা ছাড়াও মনটা আমার একদম ভাল নেই ।"

"কী হয়েছিল, খুলে বলুন তো !" সুনৃত বলল ।

ওরা রোজই বিকেলে বেরিয়ে যায় । রাতের খাওয়া বাইরে থেকে সেরে আসে । আটটা সাড়ে-আটটার মধ্যে এসে ঢুকে পড়ে রোজ । কোনও-কোনও দিন লিভিং-রুমে আমাদের সঙ্গে বসে টিভি দ্যাখে বা শাহিনের সঙ্গে আড্ডা মারে । ক'দিন তো শাহিন শয্যা নিয়েছে । তবে আমার ধারণা ওই ডাকাবুকো মেয়ে তিনটি মুফির খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে । এবং যারা মুফিকে ধরেছে তাদের হাতেই ওদের কিছু-একটা অনিষ্ট ঘটেছে । বাই দি ওয়ে, দিল্লিতে পুলিশ একটা বাচ্চাকে ট্রেস করতে পেরেছে । আনোয়ার চলে গেছে তাকে আইডেনটিফাই করতে ।"

জিত বলল, "মহা মুশকিল হল তো ! পৃথ্বীশ তুই কি এখনও মনে করছিস অরিন্দম লুকিয়ে আছে ? আমার তো মনে হচ্ছে বিরাট একটা গ্যাং এর পেছনে কাজ করছে । মুফির মতো বাচ্চাকে লোপাট করা এক জিনিস, আর তিনটে জলজ্যান্ত মেয়েকে উধাও করা আর-এক জিনিস । আমাদের কিন্তু এত নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা উচিত হচ্ছে না ।"

আলিসাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, "কী বলতে চাইছ জিত ? পুলিশ যা করার করছে । তোমরা তিনমূর্তি এর মধ্যে নাক গলিয়ে আর নতুন ফ্যাসাদ বাধিও না । মেয়ে তিনটি তো আমাকে একেবারে শাসিয়ে গেছে । তোমাদের এই নিউ জেনারেশনকে কিছু বলাও মুশকিল ।"

উনি দুমদুম করে চলে গেলেন ।

সুনৃত বলল, "আলিকা হেভি আপসেট ।"

জিত বলল, "বন্ধুগণ, আমরা সাবধান থাকব ঠিকই, কিন্তু গার্জেনদের নিষেধ-বাক্য মেনে নিষ্ক্রিয় থাকবার দিন কি আমাদের চলে যায়নি ? আমার মতে আমাদের অ্যাক্‌শন এবার আরম্ভ হোক । রাজি ?"

বাকি দু'জন একসঙ্গে বলল, "রাজি ।"

ক'দিন ল্যাবে ঢোকা হয়নি । পাতলা ধুলোর একটা আস্তরণ পড়েছে সবকিছুর ওপর । তিন বন্ধু মিলে যত্ন করে ঝাড়পোঁছ করতে লাগল । বিকার, টেস্ট-টিউব সুদ্ধু স্ট্যাণ্ড, উলফ্ বট্‌ল, ফ্লাস্ক্, নানারকম কেমিক্যালের শিশিগুলো, ব্যারোমিটার—হাজার জিনিস জড়ো করেছে সবাই মিলে । হঠাৎ রঙ্গচারী বলল, "এই রিটর্টটার পেছনে এটা কী রে জিত, ট্রানজিস্টর রেডিও ?"

রঙ্গচারী যে জিনিস তুলে ধরল সেটা একটা ছোট বলের মতো । আপাদমস্তক নানা রঙের ছোট-ছোট বোতাম । সবাই হাতে করে দেখতে লাগল জিনিসটা । হাতে করেই চমকে উঠল সবাই । শোলার মতো হালকা, এবং গোল ও মসৃণ হলেও গড়ায় না । যেখানে রাখো আঠা-লাগানো বস্তুর মতো আটকিয়ে থাকে । বোতামগুলো বেরিয়ে নেই । গোলাকার তলাটার ওপর কতকগুলো নানা রঙের টিপের মতো দেখাচ্ছে সেগুলোকে । সুনৃত হাতে নিয়ে একটু ইতস্তত করে সবুজ বোতামটা টিপল । কিছুই হল না । তারপর সাহস করে ওরা সবাই এলোপাথাড়ি কয়েকটা বোতাম টিপে গেল । কিছুই ঘটল না ।

জিত বলল, "চল্ এটা হোস্টেলে নিয়ে যাই । এটা যাই হোক, নিশ্চয়

অরিন্দমের বানানো।"

এমন সময় রঙ্গচারী দারুণ চমকে চেঁচিয়ে উঠল, "দ্যাখ্ দ্যাখ্ জিত আমি অন্যমনস্ক হয়ে এটা পকেটে ঢোকাতে গিয়েছিলাম, জিনিসটা কী সুন্দর স্কুইজ করে আমার পকেটের মাপে ছোট্ট, চ্যাপটা হয়ে গেছে।"

তিনজনেই অবাক। শেষ দিকে অরিন্দমের হাবভাব দেখে ওরা ক'দিন ল্যাবটা ওকেই পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিল। অরিন্দম অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করত। একটা পুরো পোর্টেবল টিভিসেট, ছোট্ট একটা একশো ওয়াটের ইনভার্টার, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি অনেক জিনিসই ও ল্যাবে বসে তৈরি করেছে। ইলেকট্রনিক্সের যন্ত্রপাতি তৈরিতে ওর দক্ষতা ছিল রীতিমত বিস্ময়কর। এই অদ্ভুত বস্তুটা কি সত্যিই ওর তৈরি। কী ধাতু এটা ? ধাতু এত হালকা ! নিশ্চয়ই পলিথিন জাতীয় কিছু। কিন্তু পলিথিনের এরকম স্থিতিস্থাপকতা আছে বলে তো জানা ছিল না।

ল্যাবে তালা ঝুলিয়ে তিনজন রোদের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে লাগল স্কুলের দিকে। আজ শনিবার স্কুল ছুটি। অনায়াসেই ওদের শখের বিজ্ঞানীগিরির সাধ মেটাতে পারত ল্যাবে বসে, কিন্তু মন লাগছে না। প্রথম কথা মুফি এবং তিস্তারা, এতদিন কেটে গেল শাহিনদির বাচ্চাটাকে পুলিশ তো বার করতে পারলই না, উপরন্তু এই তিনটি মেয়ে। হয়তো ওরা কোথাও গিয়ে আটকে গেছে, হয়তো ফিরবে। আশা করা যাক, কিন্তু ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, অরিন্দমের জন্য এবার সত্যি-সত্যি দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এতদিন ধরে ও স্রেফ লুকিয়ে বসে থাকবে, ওদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করবে না এটা অবিশ্বাস্য। তৃতীয়ত, এই অদ্ভুত বস্তু।

কিউবেই ওরা ব্রেকফাস্ট আনিয়ে নিল। আজ শনিবারের স্পেশাল। ছোলা-বাটোরা। বড়-বড় গ্লাসে চকোলেট দুধ। এটা ওরা গলাধঃকরণ করেছে দেখে তবে ভাণ্ডারী যাবে। ফাদারের সেইরকমই নির্দেশ। তিনি নাকি দু-তিন দিন ওদের ঘরের পেছনের বাগানে কিছু ঝোপঝাড় দুধে অভিষিক্ত থাকতে দেখেছেন। খেতে-খেতে পকেটের মধ্যে জিনিসটাকে নাড়াচাড়া করছিল পৃথ্বীশ রঙ্গচারী। এটা কি রাবার ? কিন্তু রাবারের রঙ এরকম স্ফটিক-স্ফটিক ? তা ছাড়া হার্ড-রাবার তো স্থিতিস্থাপক হবার কথা নয়। পকেটে ঢুকে জিনিসটা কীরকম আপাদমস্তক ছোট আর চ্যাপটা হয়ে গেছে। কোথাও কোনও খোঁচ বা ভাঁজ পড়েনি। খুবই আশ্চর্য ! এটা কী বস্তু ? ওর পনেরো বছরের সায়েন্স ও প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে নেই এ-জিনিসটার ব্যাখ্যা। রঙ্গচারী অন্যমনস্ক হয়ে জিনিসটা পকেটের মধ্যেই টেপাটেপি করছিল, হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল। কী টিপেছে ও জানে না, ওর পকেটের মধ্যে থেকে অরিন্দমের গলার স্বর ভেসে আসতে লাগল, "আমি একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পাস করছি। পৃথ্বীশ, তোরা যদি জানতে পারতিস আমি কী করতে পেরেছি।"

পকেট থেকে তাড়াতাড়ি করে বস্তুটা বার করতে গিয়েছিল ও। সুইচ অফ হয়ে যাওয়ার জন্যে বোধহয় কথা বন্ধ হয়ে গেল। আর টেপাটেপি করতে জিত বারণ করল। যদি খারাপ হয়ে যায়। এটা কি টেপ-রেকর্ডার ? অরিন্দম নিজের কিছু-কিছু কথা টেপ করে ধরে রেখেছে ? যাই হোক, সূত্র তো একটা পাওয়া গেল ! অরিন্দম একটা নতুন কিছু করতে পেরেছে, যেটা অরিন্দমের নিজের কাছেই বিস্ময়কর। কে জানে এই নতুন আবিষ্কার-সংক্রান্ত কাজেই ও কোথাও উধাও হয়েছে কি না, কিংবা এটার কথা জানতে পেরে কোনও দুষ্কৃতকারী ওকে গায়েব করেছে কি না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, আবিষ্কৃত বস্তুটা কি এমনি অবহেলায় ল্যাবে পড়ে থাকত ? বস্তুটাতে হাত বুলোতে-বুলোতে রঙ্গচারী বলল, "আওয়ার লিট্‌ল ট্রানজিস্টার।"

সুনৃত ফোড়ন কাটল, "ঈশ্বর জানেন ট্রানজিস্টারও হতে পারে। রেজিস্ট্যান্স ট্রান্সফার না করে ডিজাস্টার ট্রান্সফার করবে হয়তো।"

॥ ছয় ॥

জ্ঞান হতে তিস্তা অনুভব করল বেশ নরম একটা স্প্রিংয়ের খাটে ও শুয়ে রয়েছে। তবে জায়গাটা সম্পূর্ণ অন্ধকার। মাথার পেছনে একটা সাঙ্ঘাতিক দপ্‌দপানি। নির্ঘাত স্যাণ্ডব্যাগ। তবে ওরা ওকে খুব শাস্তি দেয়নি দেখা যাচ্ছে। অবাঞ্ছিত কৌতূহল প্রকাশের জন্য এর চেয়ে বেশি শাস্তি ওর পাওনা ছিল। বেশ নরম-গরম খাটে শুইয়ে রেখেছে। কিন্তু বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে ওর ভুল ভাঙল। খাটটার সঙ্গে ও আগামোড়া পিছমোড়া করে বাঁধা। খুব সম্ভব শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে। মাথাটা ও ঘোরাতে পারল না প্রথম চেষ্টায়। তিস্তা বোঝবার চেষ্টা করল ও সেই ঘড়ির দোকানের পেছন দিকের কোনও ঘরেই আছে কি না। বুঝতে পারল না।

শেকল-তোলা ঘরটার মধ্যে কী ছিল তা জানা নেই। মুফি ছিল নির্ঘাত। পাশের ঘরটার আসবাবপত্র ছিল অন্যরকম। অন্ধকার চোখে সয়ে গেল অনেক কষ্টে ঘাড় সামান্য কাত করে ও দেখল, ওর ডান দিকের খাটে, দূর্বাদি, বাঁ দিকের

খাটে র‍্যাচেল। সর্বনাশ, এরা কী করে এল ! কোথায় ও ভাবছিল দূর্বাদি এতক্ষণে মুসৌরি থানা তছনছ করে ফেলছে ওর জন্যে ! দু'জনে একই ভাবে বাঁধা। ঘুমোচ্ছে। দূর্বাদির আবার ফুররর ফুররর করে নাক ডাকছে। আশ্চর্য ! ওদের কি ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে ? নিশ্চয়ই !

চাপা গলায় তিস্তা ডাকল, "র‍্যাচেল, র‍্যাচেল ! দূর্বাদি।" কোনও সাড়া নেই। মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে দু'জনে। কিন্তু এইভাবে আওয়াজ করায় একটা বিতিকিচ্ছিরি ফল হল। ঘরের একটা অন্ধকার কোণ থেকে আপাদমস্তক বোরখায় ঢাকা একটা ভয়াবহ নারীমূর্তি উঠে দাঁড়াল। নিঃশব্দে তিস্তার বাঁ দিকে এসে দাঁড়াল। মুখে কোনও কথা নেই, তারপর দুটো কর্কশ হাত বেরিয়ে এসে তিস্তার বাঁ বাহুতে একটা ছুঁচ ফুটিয়ে দিল। খুব আনাড়ি হাত। তিস্তার ভীষণ লাগল। মুখ দিয়ে শুধু 'উঃ' বলে একটা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই করতে পারল না। অসহায়ের মতো ইনজেকশনটা নিল এই কথা ভাবতে ভাবতে যে, রহস্য-গল্পের গোয়েন্দাদের অলৌকিক ক্ষমতার শতাংশের একাংশও ওর নেই। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ওর চেতনা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেল।

॥ সাত ॥

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর জিত ওর ডেস্ক থেকে গোলকটা বার করল। এটা ওরা পালা করে-করে এক-একজনের কাছে রাখবে স্থির করেছে। আজ জিতের পালা। রঙ্গচারীর পকেট থেকে ছাড়া পেয়েই জিনিসটা আবার আন্দাজ বারো মিলিমিটার ব্যাসের একটা গোলকে পরিণত হয়েছে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরীক্ষা করতে করতে জিতের হঠাৎ খেয়াল হল, একটা কালো বোতাম অন্য বোতামগুলোর থেকে একটু দূরে রয়েছে। সেটা টেপার সঙ্গে-সঙ্গে টেলিফোনের ডায়াল-টোনের মতো একটা মৃদু আওয়াজ হতে লাগল যন্ত্রটাতে। কালোর পরেই একটা সোনালি বোতাম। সেটাও টিপল জিত। সঙ্গে-সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল। গোলকের ভেতরটা কীরকম একটা নরম আলোয় ভরে গেল। তার মধ্যে খুব আবছাভাবে অরিন্দমের মুখ ভেসে উঠল। কীরকম অদ্ভুত অরিন্দম। চুলগুলো ছোট-ছোট, চোখ দুটো অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে। কপালের মাঝখানে একটা গভীর ভাঁজের মতো কাটা দাগ। জিত সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোটখাটো বৈদ্যুতিক শকের মতো কিছু অনুভব করল। গোলকের অরিন্দম বলল, "জিত, প্লিজ, আমার যন্তর-মন্তরটা দিয়ে দে।"

জিত বলল, এটা তোর ? তুই করেছিস ?"

অরিন্দম হাসল, "করেছিও বলতে পারিস, করিনিও বলতে পারিস।"

"রহস্য রাখ। এটা তো আশ্চর্য যন্ত্র। কী কাজ এটার ?"

"বুঝতে পারছিস না ? ওটা থট-ট্রান্সমিটার। তোর সঙ্গে আমার চিন্তার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে যন্ত্রটা।"

"কীভাবে এটা করলি, অরি ?"

"পরে বলব। এখন ওটা দিয়ে দে।"

"কীভাবে দেব ? কোথা থেকে তুই কথা বলছিস ?"

"দ্রেবুং লামাসারি থেকে। লাসা।"

"কী বললি ?"

"যা বললুম, তা বললুম। সে যাই হোক, সেখানে তো তুই আসতে পারছিস না। কালো বোতামের পিছনে একটা সাদা বোতাম আছে সেটা টেপ। যন্ত্রটাই তোকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। শোন্। কালো বোতামটা টিপলে তবে যন্তর চালু হয়, সোনালি বোতামটা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায়। আচ্ছা এবার যাই ভাই, সি ইউ।"

অরিন্দমের মুখটা স্ফটিকের আলোর বৃত্তে হারিয়ে গেল। জিত প্রথমটা হতভম্ব হয়ে রইল। তারপর অরিন্দমের কথামতো সাদা বোতামটা টিপল। কিছুক্ষণ পরে ও অনুভব করল কিছু যেন একটা ওকে চুম্বকের মতো টানছে। স্থির থাকতে দিচ্ছে না। ও সন্তর্পণে করিডরে বেরিয়ে এল। করিডরের আলো রাতের মতো নিবে গেছে। সুনৃত, পৃথ্বীশকে ডাকবে নাকি ? ডাকা উচিত। ওরা তিনজনে মিলে অরির খোঁজ করবে। মুফির অনুসন্ধান করবে। তিস্তাদিদের সাহায্য করবে—এই স্থির হয়েছিল। ওর একা যাওয়া মানে স্বার্থপরতা। পৃথ্বীশের কিউবের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু চুম্বকের মতো সেই টানটা ওকে ডাইনিং-হলের দিকে টানতে লাগল। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই সেদিকে এগিয়ে গেল ও। আস্তে করে দরজার খিল খুলল। ভেজিয়ে দিয়ে কিচেন-গার্ডেন থেকে একটা ভারী পাথর নিয়ে এসে দরজার গায়ে ঠেসে দিল। নইলে সারা রাত দরজাটা হা-হা করবে। ঠাঁই-ঠাঁই আওয়াজ করবে।

ঠাণ্ডা তারা-জ্বলা রাত। আকাশ থেকে হিম ঝরছে, জিত স্লিপিং সুটের ওপর শুধু ওর স্কুলের ব্লেজারটা চাপিয়ে নিয়েছে। মাথা খালি। ওর ঢেউ-খেলানো নরম চুল ভেদ করে ঠাণ্ডাটা ছুঁচের মতো বিঁধছে। অদৃশ্য একটা চুম্বক ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য ! ওই তো তিব্বতি রেস্তোরাঁ শিগাৎসি। উলটো দিকের

পাকদণ্ডী দিয়েই তো ওরা সেদিন নেমেছিল ! হুড়হুড় করে নেমে যাচ্ছে জিত। যেন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। দূরে দেখা যাচ্ছে একটা কাঠের বাড়ি। তিন-কোনা মাথাটা। তিব্বতি ভাষায় কিছু লেখা দরজার মাথায়। কাঠের দরজা সামান্য ঠেলতেই খুলে গেল। লম্বা প্যাসেজ। জিত এগিয়ে চলেছে। কোথাও কেউ নেই। একটা চৌকোনো উঠোন। তার তিনদিকে ঘর, একদিকে একটা খোলা গুহামুখের মতো, তার দু'দিকে দুটো বুদ্ধমূর্তি। ধর্মচক্রমুদ্রায় বসে আছেন। মঙ্গোলীয়-মুখ বুদ্ধ। ঘরের ভেতর সম্পূর্ণ অন্ধকার। শুধু এক কোণে একটা বাতি জ্বলছে। প্রথমে ঢুকে কিছু দেখতে পায়নি জিত। তারপর বাতির আলোয় দেখতে পেল একটা লম্বা কাঠের পাটাতন। তার ওপর একজন লামা শুয়ে।

কাছে এগিয়ে জিত বিস্ময়ে স্থাণু হয়ে গেল। পাটাতনের ওপর শায়িত লামা আর কেউ নয়। তারই প্রিয় বন্ধু অরিন্দম চোপরা। যেন ঘুমোচ্ছে। দু'হাত দু'দিকে বুকের সঙ্গে লেগে রয়েছে। পরনে লামার লাল পোশাক। চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা। দুই ভুরুর কপালে একটা গভীর কাটা দাগ, যেমন যন্তর-মন্তরে দেখেছিল। কিন্তু অরিন্দমের বুকে কোনও ওঠা-পড়া নেই। যেন ওর নিশ্বাস পড়ছে না। প্রচণ্ড উদ্বেগে জিত তক্ষুনি হাঁটু গেড়ে বসল। অরিন্দমের একটা হাত তুলে নিতে গেল। হঠাৎ গুরুগম্ভীর একটা কণ্ঠস্বরে গুম্ফার নিস্তব্ধতা ভেঙে খানখান হয়ে গেল। "ওকে ছুঁয়ো না। সর্বনাশ হয়ে যাবে তোমার বন্ধুর।" ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে কেউ বলল। শিউরে দাঁড়িয়ে পড়ল জিত।

পিছন দিকে একটা নিচু দরজা দিয়ে একটা ঘরের একাংশ দেখা যাচ্ছে। মেঝেতে পদ্মাসনে বসা একজন লামা। তিনি বেরিয়ে আসতে-আসতে কোনও অদৃশ্য ব্যক্তিকে লক্ষ করে বললেন, "চোমো, তোমাকে বহুবার বলেছি এখান থেকে নড়বে না। আরেকটু হলেই কী সর্বনাশ হত বলো তো !" জিতের দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি এখানে এলে কী করে ? আগুন নিয়ে খেলা করছ ? অরিন্দম চোপরার এই বডির কথা কাউকে বলবে না। বললে ওরই বিপদ হবে।"

জিতের আর সহ্য হল না, বলল, "লজ্জা করে না আপনাদের ? ওকে আপনারা মেরেছেন, তারপর নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বডিটাকে এইভাবে প্রিজার্ভ করে রেখেছেন। তান্ত্রিক-টান্ত্রিক জাতীয় লোকেরা শবসাধনা করে শুনেছি। আমি আপনাদের নামে পুলিশে রিপোর্ট করব গিয়ে।"

জিত লক্ষ করেনি ওর দু'পাশে দুই ষণ্ডামার্কা লামা কখন এসে দাঁড়িয়েছে। প্রধান লামার চোখের নির্দেশে মুহূর্তে একজন জিতের ঘাড়ের নীচের একটা জায়গা টিপে দিল। জিত দেখল ও আর নড়তে পারছে না, সমস্ত শরীর অসাড়। আস্তে আস্তে ওকে বসিয়ে দিল লামারা। দ্বিতীয়জন এইবার ওর দুই ভ্রূর মাঝখানে একটা জায়গা দু'আঙুলে টিপে ধরল। প্রথমে জিত লাল-নীল নানা রঙের খেলা দেখতে লাগল চোখের সামনে। তারপর আস্তে-আস্তে কীরকম একটা চিনচিনে অনুভূতি তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

চিনচিনে ভাবটা কমে গেলে জিত একটা বড় অদ্ভুত জিনিস দেখতে পেল। ও দেখল, ঘরের আসবাবগুলো সব ছায়া-ছায়া। ওর সামনে অরিন্দমের শায়িত দেহ। ঠিক তেমনি নিস্পন্দ নিথর হয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু কী আশ্চর্য ! তার ওপর যেন হাওয়ায় ভাসছে আরেকটা অরিন্দম। দুই অরিন্দমের মাঝখানে একটা সূক্ষ্ম রুপোলি সুতো। ভাসমান অরিন্দম আস্তে-আস্তে গুম্ফার ছাদে গিয়ে ঠেকল। হাত নেড়ে একটা বিদায়ের ভঙ্গি করল। তারপর ছাদের কাঠের সিলিং ভেদ করে জিতের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

লামা দু'জন ততক্ষণে তার ঘাড়ের নীচে এবং ভ্রূর মাঝখানের জায়গা দুটো ডলতে আরম্ভ করেছে। প্রধান লামা বললেন, "শুধু তোমাকে আশ্বস্ত করবার জন্য অরিন্দমকে সুদূর লাসা থেকে আনাতে হল। সূক্ষ্ম শরীরে ও সেখানে অনেক কিছু শিখছে। স্থূল শরীরটার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে ওই রুপোলি সুতো। ওর শরীরটা নাড়াচাড়া করলে সুতো ছিঁড়ে যেতে পারে। ও আর শরীরে ফিরে আসতে পারবে না। এ-কথা কাউকে বোলো না। বহু যুগ পরে আমাদের গুপ্তবিদ্যা দিয়ে যাবার উপযুক্ত পাত্র পেয়েছি। বাধা দিও না। পৃথিবীর মঙ্গল হবে।"

জিতকে একটা কাঠের পাটাতনে শুইয়ে দেওয়া হল। লামা গম্ভীর গলায় বললেন, "পো-চা-কে-শো।" আরেকজন লামা বাটিতে করে কী একটা তরল বস্তু সামনে রাখলেন। স্বহস্তে চামচ করে বস্তুটা জিতকে খাইয়ে দিতে-দিতে প্রধান লামা বললেন, "এই মাখন-চা খেয়ে নাও। শরীরে বল ফিরে পাবে।"

জিনিসটা খেতে খুব বিশ্রী হলেও খাবার পর জিত সত্যিই একটু সুস্থ বোধ করল। সেই অসাড় ভাবটা একদম কেটে যাচ্ছে। তিনজন মিলে ওকে সাবধানে তুলে ধরে গুম্ফার বাইরে বার করে দিলেন। তখনই জিতের খেয়াল হল যন্তর-মন্তরটা কোথায় ? সেটার টানেই তো এখানে আসা। সেটা এখানে দিয়ে গেলেই তো অরিন্দম পেয়ে যাবে। ও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি অরিন্দমের

একটা জিনিস দিতে এখানে এসেছিলাম। ও-ই আমায় আসতে বলেছিল।"

লামারা তিনজনেই ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। প্রধান লামা বললেন, "কী জিনিস ?" জিত বর্ণনা দিল জিনিসটার। ওঁরা তিনজন ঢুকে গিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজলেন জিনিসটা। একটু পরে ফিরে এসে বললেন, কোনও জিনিসই তাঁরা গুম্ফার ভেতরে দেখতে পাননি। পেলে অরিন্দমকে নিশ্চয় দিয়ে দেবেন। জিত রাতের অন্ধকারে হোস্টেলের পথ ধরল।

॥ আট ॥

পৃথ্বীশ আর সুনৃত ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিয়েছে। স্নান-টান সেরে খুব ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। সুনৃত বলল, "জিত কিন্তু ঘরে নেই। নিশ্চয়ই আমাদের আগেই উঠে বেরিয়ে গেছে। চল্ ল্যাবে যাই। কতকাল কাজকর্ম করি না।"

এই সময়ে ক্লাস-টেন-এর গুরুবচন সিং ও চাওলা বলে দুটি ছেলে এসে বলল, ফাদার ওদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

আজ ফাদার জোনাথনের ঘরে দু'জন পুলিশ অফিসার এসেছেন। ফাদার ওদের দেখিয়ে বললেন, "এই যে, এদের কথাই বলছিলাম মিঃ খান্না। পৃথ্বীশ, এঁরা দেরাদুন থেকে আসছেন," তারপর বললেন, "জিত কই ?"

পৃথ্বীশ বলল, "জিত বোধহয় আমাদের আগেই উঠেছে, জগিংয়ে বেরিয়ে গেছে।"

একটি অফিসার বাঁকা হাসি হেসে বললেন, "ফাদারের কাছে শুনলাম তোমরা নাকি মিসিং চোপরার অন্তরঙ্গ বন্ধু। অথচ সে হারিয়ে যাওয়ায় তোমাদের মনে কোনও উদ্বেগ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না ? য়ু আর অভিয়াসলি ফলোয়িং ইয়োর ডেইলি রুটিন !"

সুনৃত বলল, "মনের উদ্বেগের জন্যে আমাদের ডেইলি রুটিনে বাধা পড়ে না, স্যার।"

পৃথ্বীশ বলল, "দুটোকে ডিটাচ করার শিক্ষা স্কুলই আমাদের দিয়েছে।"

সুনৃত হেসে বলল, "তা ছাড়া আপনাদের মতো এফিসিয়েন্ট পুলিশ অফিসার থাকতে অরিন্দমের কোনও বিপদের আশঙ্কা আমরা করি না। মাত্রই তো সাতদিন হল হারিয়েছে আমাদের বন্ধু। বছর-খানেকের মধ্যে খুঁজে বার করতে পারবেন আশা করি।"

ফাদার হাত তুলে বললেন, "ব্যস, ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে বয়েজ।"

অফিসারটি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "যদি বলি তোমাদের বন্ধুটি কোথায় কী উদ্দেশ্যে গা-ঢাকা দিয়েছে তোমরা খুব ভাল করে জানো ? যদি বলি, তোমরা তাকে এখনও সাহায্য করে চলেছ ?"

সুনৃত বলল, "বেশ তো ! য়ু আর ফ্রি টু ফলো আস। পেছনে টিকটিকি লাগান।"

"জানো, তোমরা যা করেছ তার জন্য কী ধরনের শাস্তি হতে পারে ?" গলা প্রচণ্ড চড়ছিল লোকটির।

ফাদার অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠানে নিজের ছাত্রদের তিরস্কার করার দায়িত্ব আর কেউ নিক, স্বভাবতই এটা তাঁর পছন্দ নয়। নরম সুরে বললেন, "ওরা সে ধরনের ছেলে নয় মিঃ খান্না, অরিন্দমের ব্যক্তিগত জীবন, অভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে কিছু বলতে পারবে বলেই ওদের এখানে ডাকিয়েছি।"

"আপনি জানেন না ফাদার," খান্না নামের অফিসারটি চোখ লাল করে গর্জন করে উঠল, "এই রকম অকালপক্ব দায়িত্বজ্ঞানহীন ছেলেদের জন্য আমাদের দেশে জুভেনাইল ক্রাইম কী রেটে বেড়ে যাচ্ছে। স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল তো দূরের কথা—এদের বাপ-কাকা পর্যন্ত জানে না এদের উর্বর মস্তিষ্কে কখন কী ক্রাইমের প্ল্যান খেলছে। আপনি জানেন না মোটামুটি এই একই সময়ে এই মুসৌরি শহরে একটি বাচ্চা এবং একটি তরুণী মেয়েও কিডন্যাপড হয়েছে ! এই ছেলে ক'টিকে আমরা ক'দিন ধরেই শ্যাডো করছি। উই আর অলমোস্ট শিওর যে, এরা চোপরার হোয়্যারঅ্যাবাউটস্ জানে।"

শেষের দিকে দুই বন্ধুর কান খাড়া হয়ে উঠেছিল। বাচ্চাটা তো মুফি। কিন্তু একটি তরুণী মেয়ে অন্তর্ধান করেছে—এটা তো ওরা জানত না। সুনৃত পৃথ্বীশের দিকে চাইল না।...পৃথ্বীশ নিশ্চয়ই এখন বোকার মতো ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওদের সেই চোখ চাওয়া-চাওয়ির কী ব্যাখ্যা দেবে এই অভব্য অফিসারটি, ভগবান জানেন।

আরও কিছুক্ষণ জেরা চলল। মনে হল, ফাদার ভেতরে-ভেতরে খুব বিরক্ত হয়েছেন। তিনি বললেন, "আচ্ছা মিঃ খান্না, আপাতত ছেলে দুটিকে আমি যেতে দিচ্ছি, আবার নতুন কোনও দরকার হলেই ওরা আপনার কাছে হাজির হবে।"

বাইরে এসে পৃথ্বীশ বলল, "তরুণীটি আবার কে রে ?"

সুনৃত বলল, "আমি তো তিনজন তরুণীর কথা জানি। দুর্বাদিরা তিনজন

রাতে ফেরেনি আলিকাকা বলছিলেন না ? এই অফিসারটি যেমন অপদার্থ, তেমন অসভ্য। তার ওপর মিস্-ইনফর্মড্। আবার আমাদের ভয় দেখাতে এসেছে। চল্ তো ওয়েসাইডে যাই।"

পৃথ্বীশ বলল, "ফাদারের কাছে যখন ডাক পড়ল আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আঙ্কল চোপরা।"

"এটা তো ভাল মনে করিয়েছিস বন্ধু !" সুনৃত বলল, "চোপরার 'চোপ রও' কিন্তু এখনও আরম্ভ হয়নি। কেন বল তো ?"

'ওয়েসাইড' হোটেলে এসে ওরা দেখল ভীষণ কাণ্ড। পুলিশে পুলিশ। আলিকাকা জবানবন্দি ইত্যাদি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। শাহিনের কাছেই শুনল ওরা ব্যাপারটা। আজ ভোরে আলিকাকা বাইরের দরজা খুলতেই নাকি দুম করে দুটো লাশের মতো কী যেন পড়ে যায়। আলিকাকা ভয় পেয়ে তাঁর ভৃত্য বির্‌খাবাহাদুরকে ডাকেন। দু'জনে দেখেন মানুষ দুটি তিস্তা আর দূর্বা। পরশুদিন যে পোশাকে বেরিয়েছিল এখনও পরনে সেই ব্লু জিন্‌স্, সেই রঙিন কার্ডিগান। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত চেহারা। তাদের ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়। সারা শরীরে আবার অ্যাল্‌কোহলের গন্ধ। যারা কুকীর্তিটি করেছে তারা বোধহয় প্রমাণ করতে চায়, মেয়ে দুটি মাতাল-টাতাল হয়ে বাড়ি ফেরেনি। স্পষ্ট কোনও ঘুমের ওষুধ ইনজেক্ট করা হয়েছে ওদের শরীরে। ঘণ্টাখানেক আগে ঘুম ভেঙেছে, কড়া কালো কফি খাওয়ানো হয়েছে বড়-বড় মগে। এখনও ঘোর পুরোপুরি কাটেনি। পুলিশকে সঙ্গে-সঙ্গে জানিয়েছেন আলিকাকা। সবচেয়ে ভয়ের কথা, র‍্যাচেল ওদের সঙ্গে নেই।

পৃথ্বীশ বলল, "তরুণীটি কে এবার বুঝলি তো সুনৃত ?"

সুনৃত বলল, "হুঁ।"

এখানে আপাতত থাকার কোনও মানে হয় না। পুলিশ ঘিরে রেখেছে দূর্বাদি আর তিস্তাদিকে। অথচ কৌতূহলও প্রচণ্ড। শাহিনদি কেঁদে-কেঁদে মুখখানাকে বোলতার চাকের মতো ফুলিয়ে ফেলেছে। মনটা ওদের ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে, চৌকাঠ পেরোতেই মিঃ খান্নার মুখোমুখি। বাঁকা হাসি হেসে বললেন, "এই যে, খুনি অকুস্থলেই ফিরে এসেছে। বাঃ বাঃ !"

বাইরে এসে রাগে ফেটে পড়ল পৃথ্বীশ, "কী মনে করেছে লোকটা ? খুনি ? অকুস্থল ? আমরা কাকে খুন করলুম ?"

সুনৃত বলল, "চেপে যাও বন্ধু। লোকটা যে-কোনও কারণেই হোক, আমাদের প্রচণ্ড অপছন্দ করছে এবং ইচ্ছে করে রাগিয়ে দিচ্ছে।"

তিস্তার মতো শক্ত মেয়ে একেবারে হাউমাউ করে কাঁদছিল। তাদের জ্ঞান ফিরেছে। নিজেদের ফিরে আসার বৃত্তান্ত অন্যের মুখে শুনেছে। যা জানে, যতটুকু জানে পুলিশকে বলেছে। কীভাবে বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনে ছুতো করে ও দোকানের ভেতরে যায় এবং ধরা পড়ে। তিস্তা ভেতরে যাবার পর নাকি চিনেম্যানটি দূর্বা ও র‍্যাচেলকে চা দিয়ে আপ্যায়িত করে, "চাইনিজ গ্রিন তি মিস, দিস ইজ দি বেস্ত তি উই ক্যান গেত হিয়াল।" ওরা ভাবে সময়টা কাটাতে হলে বোধহয় চা'টা খাওয়াই ভাল। শিখ এবং চিনেটিও নিজেদের জন্যে চা আনায়। দূর্বা আবার কায়দা করে শিখের সঙ্গে নিজের কাপ বদলাবদলি করে নিয়েছিল। তা সত্ত্বেও চা খাওয়ার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ওদের হাত-পা ঝিমঝিম করতে থাকে। বড়-বড় হাই ওঠে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা নিজেরাই জানে না। ঘুম ভাল করে ভেঙেছে আজ। কিন্তু তিস্তার চোখের জল আর বাধা মানছিল না। র‍্যাচেল মিডফোর্ড তার কতদিনের বন্ধু। কলকাতার ওয়াই. ডবলু. সি. এ-তে টেবিলটেনিস খেলতে গিয়ে আলাপ। খুব বুদ্ধি মেয়েটার। তিস্তার মতো লড়িয়ে না হলেও এই বুদ্ধির জন্য ওকে তারিফ করে তিস্তা। ও কী করে র‍্যাচেলের মা'র কাছে মুখ দেখাবে ?

কী ভয়ানক এই দুর্বৃত্তরা ! মুফির মতো শিশুকে নিয়েছে, র‍্যাচেলকে নিল। কী উদ্দেশ্য ওদের। ওদের তিনজনকেই বন্দী করে রাখতে পারত। যা হবার একসঙ্গে হত। বেচারি র‍্যাচেল। ভিতুর একশেষ। ভয়েই তো ও মরে যাবে।

দূর্বা অনেকক্ষণ ধরে তিস্তার কান্না শুনছিল। বলল, "তুই তো জানিস তিস্তা, সব সমস্যারই একটা-না-একটা সমাধান আছে। পুলিশ ঘড়িদোকান রেইড করতে গেছে, র‍্যাচেলকে আমরা নিশ্চয়ই ফিরে পাব, বিপদের সময়ে এরকম অধৈর্য হয়ে পড়লে চলে ?"

॥ নয় ॥

'ওয়েসাইড' হোটেলের দরজায় যখন দূর্বাদের ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, তখন র‍্যাচেল মুখ শুকনো করে একটা অন্ধকার ঘরের কড়িকাঠের দিকে চেয়েছিল। দিন কি রাত বোঝার উপায় নেই। ঘরের মধ্যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। হাতের রেডিয়াম-ডায়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল পাঁচটা দশ। যদি বিকেল হয় তা হলে সার্কাস অ্যাভিনিউয়ের খুদে একতলা ফ্ল্যাটটা থেকে ওর ভাই ভ্যাল টেনিস র‍্যাকেট হাতে করে বেরিয়ে যাচ্ছে। মা ঘরে তালা দিয়ে জলি-আন্টির

বাড়ি টিভি দেখতে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বেচারির শখের অন্ত নেই। মায়ের ধারণা ছেলে অন্তত একটা দ্বিতীয় কৃষ্ণান তো হবেই! মেয়েও হবে নাম-করা গাইয়ে। ডরিস ডে'র মতো ভরাট মিষ্টি গলাখানা। অন্যান্য অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মায়ের মতো আই. সি. এস. ই. পাশ করা মাত্রই মেয়েকে স্টেনো-টাইপিস্ট করে তোলার চেষ্টা করেননি তিনি। র‍্যাচেল কলেজে পড়ছে। পিয়ানো শিখছে। গান গাইছে। ভবিষ্যৎ ডরিস ডে'র কী করুণ অবস্থা।

ওদিকের ঘরটাতে কারা যেন কথা বলছে! ঘরটাতে কি পার্টিশন? প্রথম দিকে শুধু গলার আওয়াজ পাচ্ছিল র‍্যাচেল। তারপর একজনের গলা বোধহয় তর্কাতর্কির জন্যে একটু চড়ল। অন্য গলাটাও। র‍্যাচেল শুনতে পেল স্পষ্ট—"ওইটুকু শরীরে আর কতটুকু মাল ধরবে? ধাড়িটাকে তো ওইজন্যেই রেখে দিলুম।"

"কিন্তু সুইডিশগুলো তো বেগার-চিলড্রেন চাইছে। তুমি তো জানো বাচ্চাটাকে দেখে ওরা বিশ্বাস করবে না সেটা। ওজন নেবে, নানারকম ডাক্তারি পরীক্ষা করাবে। ম্যালনিউট্রিশনের সিমটম না পেলে আমাদের ভোগাবে কিন্তু সেবারের মতো।"

"হুঁ, সাহেবি ন্যাকামির কথা বাদ দাও তো। জীবন কখনও থার্ড ওয়ার্ল্ডে পা দেয়নি। ইন্ডিয়ার বেগার-চিলড্রেন কী জিনিস তা জানে? ব্লন্ড না হলে পছন্দ হয় না। কালো চুল দেখলেই খুঁত-খুঁত করবে, দেখে-দেখে সিন্ধি-পার্শিদের বাচ্চাগুলো ধরতে হয়। তা ছাড়া এতদিনেও কি যথেষ্ট ম্যালনিউট্রিশন হয়নি?"

"তা অবশ্য। চিঁ-চিঁ করছে বাচ্চাটা। আর কাঁদতেও পারছে না। জাস্ট প্রাণধারণের মতো ক্যালোরিটুকু দিয়ে যাচ্ছি। তা হলে কলকাতা আর কানপুরের লটটার সঙ্গে মিক্স করে ওকে...।"

"হ্যাঁ, আর ধাড়িটার ইনসাইডে মাল যাবে। ডাঃ মালহোত্রাকে ইমিডিয়েটলি কেব্‌ল করো। দেরি করে লাভ নেই।"

র‍্যাচেল শক্ত কাঠ হয়ে রইল। বাচ্চাটা কে? মুফি? তাকে সুইডেনে পাঠাবে? নিঃসন্তান দম্পতির কাছে ভিখিরি-বাচ্চা বলে বিক্রি করতে? আর ধাড়িটা কে? ও নিজে? ওর ইনসাইডে মাল যাবে? র‍্যাচেলের মনে হল, ভয়ে ও এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। উঃ। তিস্তা কোথায়? দূর্বাদি? দূর্বাদি? ঘরে অন্ধকার একটু-একটু করে পাতলা হচ্ছে। র‍্যাচেল দেখল অনেক উঁচুতে একটা তারের জাল-দেওয়া জানলা। এইবার ওই জানলাপথে একটু-একটু করে সকালের আলো আসছে। আসবাবপত্রহীন, সিমেন্টের মেঝে-অলা একটা ন্যাড়া ঘরে সে একটা তক্তাপোশের ওপর শুয়ে আছে। হাত এবং পা জোড়া করে বাঁধা। খুব দুর্বল লাগছে। নড়তেই বাঁ দিকের বাহুটা টনটন করে উঠল। ইন্‌জেকশনের ব্যথা। ওরা তা হলে ওকে একটার-পর-একটা ইন্‌জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখছে?

র‍্যাচেল দাঁত দিয়ে বাঁধন কাটতে চেষ্টা করল। হঠাৎ বাইরে তালা খোলার শব্দে নিশ্চুপ অনড় হয়ে গেল। বাইরের দরজা সামান্য খুলে বোরখা-পরা একজন কেউ ঢুকল। হাতে একটা প্লেট আর গ্লাস। তক্তাপোশের একদিকে জিনিসগুলো নামিয়ে রাখল মহিলাটি। র‍্যাচেল তখনও কাঠ হয়ে পড়ে আছে। চোখ বোজা, নিশ্বাস প্রায় বন্ধ। বোরখাধারিণী ওকে নাড়াল খানিকটা। তারপর আপনমনে বলল, "ঘুম ভাঙেনি এখনও দেখছি। ভালই হল। ডাঃ মালহোত্রা আসা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকলে ভালই হয়।"

র‍্যাচেল হতভম্ব, কারণ, কণ্ঠস্বর পুরুষের। জিনিসগুলো র‍্যাচেলের পাশে নামিয়ে রেখে বোরখাধারী পুরুষটি পেরিয়ে গেল। বাইরে তালা লাগানোর আওয়াজ হল আবার। র‍্যাচেল ভাবল, গোয়েন্দা-গল্পের নায়িকা হলে সে এতক্ষণে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে ঘুমের ভান করে পড়ে আছে। লোকটা নিচু হওয়া মাত্র জোড়া-পায়ের আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে খোলা দরজা দিয়ে পালাচ্ছে। হরিণের মতো ছুট লাগাচ্ছে যতক্ষণ না থানায় পৌঁছয়।

এই সময়ে পাশের ঘরে আবার গুনগুন শুরু হল। "অর্গ্যানগুলোর অ্যাপ্রক্সিমেট ওজন জানা চাই।"

"সেইমতো মাল...।"

এইসব কথা মাঝে-মধ্যে শুনতে পেয়ে প্রচণ্ড ভয়ে চোখ বুজল র‍্যাচেল।

॥ দশ ॥

বাইরের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে নিজের কিউবে বসে ছিল জিত। বাইরে কিছু বাঁদর-বাঁদরি বাচ্চা নিয়ে খেলা করছে। দিনের আলো এখন নিবে আসছে। আজ সারাদিন ও ঘর থেকে বার হয়নি। চুপচাপ একা-একা কাটিয়েছে। বন্ধুরা ওর রাত্রির অভিজ্ঞতার কিচ্ছু জানে না। সেজন্য কেমন একটা অপরাধবোধ ওর মনের মধ্যে। এই গোপনতার ভার ওকে একলাই বহন করতে হবে। লামা

বলেছেন, গোপন না করলে অরিন্দমের সমূহ বিপদ। এখনও, যা দেখেছে, শুনেছে, ওর বিশ্বাস হতে চাইছে না সেটা। দুটো অরিন্দম! একটা মৃতের মতো শুয়ে, আর-একটা কাঠের সিলিং ভেদ করে অনায়াসে চলে গেল? কী অদ্ভুত! বোঝাই যাচ্ছে, অরিন্দম যেখানে গেছে স্বেচ্ছায় গেছে। যা করছে স্বেচ্ছায় করছে। কিন্তু মুফিয়া? পৃথ্বীশদের কাছে শুনেছে দূর্বাদি ও তিস্তাদি ফিরেছে। যে কারণেই হোক দুর্বৃত্তরা ওদের ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। দূর্বাদি ওস্তাদ অ্যাথলিট। তিস্তা মুখার্জির নাম একডাকে সবাই চেনে। কাগজে ছবি দেখে। এখানে ওকে দেখামাত্র চিনে ফেলেছিল ও। কিন্তু র‍্যাচেল মিডফোর্ড নামের ওই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েটি ফেরেনি। এইসব ব্যাপারের সঙ্গে অরিন্দমের অন্তর্ধানের কোনও যোগ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। যত দূর মনে হয়, বড় লামা ওর ওপর খুব অসন্তুষ্ট নন, বেশ কিছু অলৌকিক ক্ষমতাও ধরেন, ওঁকে এই বিপদটার কথা বলে ওঁর সাহায্য নেওয়া যায় না! তবে কাজটা করতে হবে সম্পূর্ণ একা। সে শপথ নিয়েছে, গুপ্ত-কথা ফাঁস করবে না।

অন্ধকার গাঢ় হওয়ামাত্র জিত বেরিয়ে পড়ল। পৃথ্বীশরা গেছে ওয়েসাইডে। ও শরীর খারাপের অজুহাতে এড়িয়ে গিয়েছিল। বন্ধুদের বাদ দিয়ে এভাবে কিছু করতে ওর বিবেকে বাধছে। কিন্তু কী আর করা যাবে? পাকদণ্ডী দিয়ে নামতে লাগল জিত। দ্রুত। একটা বুনো এপ্রিকট গাছ ওর দিক্‌চিহ্ন। এইখানটায় দাঁড়িয়ে তিব্বতি গুম্ফায় যাবার দিক ঠিক করতে হবে ওকে। কারণ, তিনটে পায়ে-চলা পথ নীচের দিকে নেমে গেছে। হঠাৎ ওর পায়ে কী একটা শক্তমতো ঠেকল। জিত নিচু হয়ে দেখল, আশ্চর্য! অরিন্দমের যন্তর-মন্তর। নিজের হাতে এটা ও গত রাতে গুম্ফায় নিয়ে যায়। সম্ভবত যখন ওরা জুডো না কিসের প্যাঁচে ওকে চলচ্ছক্তিরহিত করে দেয়, তখনই জিনিসটা হাত থেকে পড়ে যায়। অথচ কোনও শব্দ শুনতে পেয়েছে বলে ও মনে করতে পারল না। কারও পায়ে লাগেনি। জিনিসটা কি আপন খেয়ালেই গড়াতে-গড়াতে চড়াই ভেঙে এইখানে চলে এসেছে?

মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে কি উপেক্ষা করতে পারে অরিন্দমের যন্ত্রটা? ভিজে ঘাস থেকে সন্তর্পণে তুলে নিল ও যন্ত্রটাকে। রুমালে মুছল, যদিও মোছার কিছু ছিল না। কেননা একফোঁটা জল বা ধুলোও যন্ত্রের গায়ে লেগে নেই। কালো বোতাম টিপল জিত। কর্‌কর্‌-কর্‌কর্‌ করে ডায়ালটোনের মতো শব্দটা হতে লাগল। সোনালি বোতাম টিপল। কিছু হল না। খারাপ হয়ে গেল নাকি যন্তর-মন্তর? কেমন যেন মরিয়া হয়ে লাল বোতাম টিপল ও। সঙ্গে-সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাণ্ড হল। গোধূলির মতো একটা আলো জ্বলল ভেতরে। সে যেন পৃথিবীর গোধূলি নয়, অদ্ভুত, অপার্থিব একটা আলো, কোনও আকৃতি দেখা গেল না। খালি স্পষ্ট সুরে জিত শুনতে পেল, "হাই, হোয়াটস্ রং?"

জিত বলল, "এভরিথিং।"

"এক্সপ্লেন।"

জিত খুব উত্তেজিত স্বরে জানাল, মুফি আর র‍্যাচেলের হারিয়ে যাওয়ার কথা। এবার যন্ত্র বলল, "ওয়েট।" একটু পরেই আবার বলল, "দে আর অ্যাট দেরাদুন। সুন উইল বি প্যাক্‌ড অফ্ টু ডেলহি। র‍্যাচেল উইল বি কিল্‌ড্ বাই টুম্‌রো আফটারনুন ইফ নো স্টেপস আর টেক্‌ন্। ডেঞ্জার। গ্রেভ ডেঞ্জার। রিপোর্টিং টু অরিন্দম। টেক দি আর্লিয়েস্ট বাস টু দেরাদুন। উইল বি ইনস্ট্রাকটেড।"

জিত যন্তর-মন্তর পকেটে পুরে দৌড়ল। ম্যাল রোডের ওপরে উঠে রিকশ নিল একটা। "জলদি চলো লাইব্রেরি বাজার বাসস্ট্যান্ড।"

তখুনি ছাড়ছিল দেরাদুনের শেষ বাস। একরকম লাফিয়ে উঠল জিত।

॥ এগারো ॥

পুলিশ যখন 'রোজা' নামের ঘড়ির দোকানটা রেইড করতে যায় তখন পৃথ্বীশ আর সুনৃত উপস্থিত ছিল তিস্তাদের বিশেষ অনুরোধে। কিন্তু ওদের নির্দেশমতো কোনও দোকান তো দূরস্থান, ওই আকৃতির কোনও দোকানই ওখানে পাওয়া গেল না। তিস্তা বলেছিল, বাঁ দিকে একটা ধাবা ছিল, তড়কারুটি বিক্রি হয়, ডাইনে ডাইং-ক্লিনিং। মাঝখানে সরু একচিলতে দোকান। নির্দিষ্ট স্থানে পুলিশ গিয়ে দেখে, একটা মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো, রেডিমেড কাপড়ের দোকানের। কাউন্টার, ফার্নিচার, প্যানেল ইত্যাদি বসানো হচ্ছে, পালিশ হচ্ছে। ছুতোরদের মারফত মালিকের পাত্তা পাওয়া গেল আড়াই ঘণ্টা পরে। এই জায়গাটা নাকি পাঁচ বছরের জন্য লিজ দেওয়া ছিল একজন শিখকে। কর্তার সিং তার নাম। তিনদিন আগে লিজ শেষ হয়ে যাওয়ায় মালিক তার জায়গাটা ফেরত পেয়েছে, এবং দোকান বসাচ্ছে। কর্তার সিং-এর ঠিকানা—হোশিয়ারপুর, পঞ্জাব।

দূর্বা ও তিস্তাকে তৎক্ষণাৎ পুলিশ-জিপে চাপিয়ে আনানো হল। তারা হতভম্ব। একটা দোকানকে দোকানই যে টুকরো-টুকরো হয়ে লোপাট হয়ে যেতে

পারে, এটা তাদের কারও ধারণার মধ্যেই ছিল না। সবাই মিলে দোকানের পেছনে গিয়ে গাদাগুচ্ছের কাঠের পার্টিশন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি। তখনকার মতো মুসৌরি পুলিশ থানায় ফিরে গেল। কর্তার সিংয়ের খোঁজে হোশিয়ারপুরে জরুরি-ফোন যাচ্ছে। ওয়েসাইড হোটেলে তখন শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

॥ বারো ॥

অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে। কোণের ঘরে শাহিনকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। আনোয়ার ফিরেছে দিল্লি থেকে। বাচ্চাটা মুফি নয়। দিল্লিরই কোনও পাঞ্জাবি-তনয়, খেলতে-খেলতে হারিয়ে গিয়েছিল। বেগম আলি শয্যা নিয়েছেন। মুকতার আলিসাহেব ঢাকা-বারান্দায় নিজস্ব চেয়ারটি পেতে চুপ। তাঁর সামনে টেবিলের ওপর বোর্ডারদের বিল-সংক্রান্ত স্তূপীকৃত কাগজ। তিনি ওখানেই বসেন, ওখানেই ঘুমোন।

রাত আন্দাজ দশটা। তিস্তা ও দূর্বাকে জোর করে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। তিস্তার ঘুম আসছে না। যদিও দূর্বার নাক ডাকছে। যে-কোনও বিপদের সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রাখার প্রশংসনীয় ক্ষমতা আছে দূর্বার। কী করে যে এই পরিস্থিতিতে ওর নাক ডাকে! হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা তীব্র ধূপ-ধূপ গন্ধ পেয়ে তিস্তা উঠে বসল। বেড-সুইচটা টিপতেই অবাক হয়ে দেখল, ওর শয্যার পাশে একজন তরুণ লামা দাঁড়িয়ে। চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা, পরনে লামাদের লাল পোশাক। দুই ভুরুর মাঝখানে একটা খাঁজের মতো লম্বাটে দাগ।

“আপনি তিস্তা মুখার্জি ? রাইফেল-শুটিংয়ে ফার্স্ট প্রাইজ পাচ্ছেন ক'বছর ধরে ?”

“হ্যাঁ।”

“সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র কিছু আছে ?”

“দুটো রিভলভার আছে।”

“আপনার সঙ্গিনী রিভলভার ব্যবহার করতে পারেন ?

“নিশ্চয়ই।”

“ওঁকে জাগিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি আসুন মুফদ্দর ও র‍্যাচেল মিডফোর্ডকে যদি বাঁচাতে চান।”

দূর্বার ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেছে। সে উঠে চিৎকার করতে যাচ্ছিল। লামাটি বলল, “আমার নাম অরিন্দম চোপরা। আমি খুব খারাপ ভাইব্রেশন টের পাচ্ছি। সমস্ত মুসৌরি শহর দুষ্কৃতকারীতে ভরে গেছে। তাদের নেতা সবচেয়ে বড় শয়তান, সেও এখন এখানেই। ভাগ্য ভাল থাকলে তাকেও আমরা ধরতে পারব। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নিন।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমন্ত ওয়েসাইড-এর দরজা থেকে একটা ল্যান্ডরোভার ছুটে চলল। গ্রিন হিল কনজারভেটরির সামনে এসে থামল গাড়িটা। দ্রুতপায়ে নেমে গেল অরিন্দম। পৃথ্বীশ আর সুনৃত তখন ঘুমে অচেতন। জানলায় উপর্যুপরি টোকার শব্দে ঘুম ভাঙল ওদের।

“আমার সুটকেস থেকে জিনস্, শার্ট আর একটা পুলোভার নিয়ে ডাইনিংহলের দরজাটা খুলে দে শিগগিরই। প্রশ্ন করিস না,” বলল অরিন্দম।

একটু পরেই তিন বন্ধু ডাইনিংহলের দরজা খুলে বাইরের হিম-ঝরা অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল। গাড়ি চালাতে চালাতে অরিন্দম বলল, “দেরাদুনের লাস্ট বাস কোনও একটা টোল-স্টেশনে ব্রেকডাউন হয়েছে। তাতে আটকে পড়ে আছে জিত। ওকে তুলতে হবে।”

সুনৃত বলল, “বলিস কী ? জিত দেরাদুনের বাসে ?”

অরিন্দম বলল, “রাগ করিস না সুনৃত, আমার যন্তর-মন্তরের নির্দেশে ও ছুটেছে দেরাদুনের দিকে। লক্ষ্য একই। মুফদ্দর ও র‍্যাচেলকে বাঁচানো। তোদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ওর সময় ছিল না। তোদের নিয়ে যাবার ভার পড়েছে আমার ওপর।”

তৃতীয় স্টেশনেই জিতকে ধরতে পারল ওরা। জিতকে দেখাবার জন্যই গাড়ি থেকে নেমে আলোর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল ওরা। জিত গাড়ি দেখেই ছুটতে-ছুটতে আসতে থাকে, “আমাকে একটু দেরাদুনে নামিয়ে দেবেন ? না গেলেই নয়—” বলতে-বলতেই বিপুল বিস্ময়ে ও বন্ধুদের দিকে চাইল। স্টিয়ারিংয়ে অরিন্দমকে দেখে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে ছোট ছেলের মতো কাঁধে মাথা রাখল জিত। বলল, “তুই সত্যি-সত্যি বেঁচে আছিস অরি ?”

“নয় তো কী ? যন্তর-মন্তরটা পেয়ে গেছিস তো আবার ?”

“হ্যাঁ, কিন্তু কী করে জানি না।”

“লামারা ওটা আমায় নিতে দিলেন না রে, বললেন, আমরা তোমায় জীবন্ত যন্তর-মন্তর বানাচ্ছি, যন্ত্র নিয়ে তুমি কী করবে ? তোমার বন্ধুর দরকার হবে। ওকে দিয়ে দাও। ও যেখানে পাবে সেখানেই রেখে আসছি যন্ত্রটা।”

তিস্তারা কিছুই বুঝল না। অবাক হয়ে শুধু শুনছিল। জিত পকেট থেকে

যন্তর-মন্তরটা বার করে তিস্তার হাতে দিল। যেতে-যেতে যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করে জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছিল অরিন্দম, "তোরা তো জানিস কিছুদিন ধরেই বিষাক্ত চিন্তার ওয়েভ দ্বারা পরিবেশ-দূষণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলুম আমি। তোরা যেটা জানতিস না সেটা হল আমার কতকগুলো এক্সট্রা-সেন্সরি পার্সেপশনের ক্ষমতা ছিল। কোনও লোকের সংস্পর্শে এলে আমি কতকগুলো সূক্ষ্ম কম্পন টের পেতাম। আমার মন বুঝে নিত সেগুলো ভাল কি মন্দ। অর্থাৎ লোকটার চিন্তার তরঙ্গ আমাকে আঘাত করত। এর থেকেই আমার মাথায় আসে শব্দের যেমন তরঙ্গ আছে, চিন্তারও তেমন তরঙ্গ আছে। ই. ই. জি. যন্ত্রে জানিস তো অস্বাভাবিক ব্রেন-ওয়েভ ধরা পড়ে। এ-ও কতকটা তাই। তবে আরও অনেক সূক্ষ্ম। আমার ধারণা হয়, চিন্তা-তরঙ্গ সাধারণ শ্রবণগ্রাহ্য শব্দ-তরঙ্গের থেকেও অনেক-অনেক কম হার্টজের কোনও শব্দ-তরঙ্গ। চিন্তা-তরঙ্গ ধরবার একটা যন্ত্র তৈরি করা ক্রমশ আমার ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে। দিল্লির মার্কেট থেকে, তা ছাড়াও নিউ ইয়র্ক থেকে কাকাকে দিয়ে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ইনটিগ্রেটেড সার্কিট ইত্যাদির বহু কল-কব্জা আনাই। ছোট্ট-খাট্টো একটা থট-ট্রান্সমিটার তৈরি করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। এক একটা চ্যানেল ধরতে পারলে এক-এক ধরনের চিন্তা-তরঙ্গ আমার আয়ত্তে আসবে এই আর কি।

"একদিন সফলও হলাম। নিজের চিন্তা নিজের কানে শুনতে পেলাম। তারপর একদিন বড় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। আরও নানারকম আনআইডেনটিফায়েড থট-ওয়েভ ধরতে-ধরতে হঠাৎ একদিন কী ধরলাম জানি না। যন্ত্রটা আমার চোখের সামনে বদলে যেতে লাগল। বাইরের পলিথিন কেসটা এইরকম অদ্ভুত রকমের হয়ে যেতে লাগল। ভেতর থেকে একটা আলোর সঙ্গে-সঙ্গে একটা জলদগম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল, 'হোয়াটস রং ম্যান, হোয়াটস রং? অ্যানাদার ওয়র ইন হুইচ ইউ প্রোপোজ টু কিল ওয়ান অ্যানাদার? স্পিকিং ফ্রম জিবুস। স্পিকিং---।

"আমি তো অবাক। শুধু বলতে পারলাম, চারদিকে ইভ্‌ল ভাইব্রেশন টের পাচ্ছি। কিছু বুঝতে পারছি না, বড্ড বিপদ।"

"স্বরটা বলল, 'ঠিক আছে, যত শীঘ্র সম্ভব হেল্প পাঠাচ্ছি।' তারপর কখন সুইচ টিপে জিনিসটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি নিজেই জানি না। তাই বলছিলাম এটা আমার তৈরি বলতে পারিস, আবার না-ও বলতে পারিস। আসলে আরম্ভ করে ছিলুম আমি, তারপর কীভাবে ওই অজানা গ্রহ জিবুসের কোনও থট-ওয়েভ ধরে ফেলে যন্ত্রটা। তারই প্রভাবে ওটা পালটে গিয়ে নিজেই নিজেকে তৈরি

করে নিয়েছে। এটা ঘটে একটা শুক্রবার।"

জিত বলল, লামাদের সঙ্গে তোর যোগাযোগ হল কী করে?"

"থট-ওয়েভ ধরতে ধরতেই লামা মিঙ্গির সেনচেনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। উনি লাসার দ্রেবুং মঠের অধ্যক্ষ। ওঁর নির্দেশ অনুযায়ী এখানকার লামারা আমাকে সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করতে শিখিয়ে দেন। সূক্ষ্ম শরীরে দ্রেবুং মঠে গিয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি যা বোধহয় এবার কাজে লাগাতে পারব।"

জিত বলল, "দ্বিতীয়বার যন্তর-মন্তর পেয়ে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করলাম, তখন পেলাম না কেন.?" "নিশ্চয়ই তখন হিপনোটিক ট্রান্স বা সম্মোহক নিদ্রায় ছিলাম। ওইভাবেই অল্পসময়ে অনেক জিনিস শেখায় ওরা তিব্বতে।"

॥ তেরো ॥

দেরাদুনে পৌঁছে যন্তর-মন্তর এবং অরিন্দম একই দিকে নির্দেশ দিতে লাগল। রাজপুত রোডের মধ্যিখানে হোটেলটা। কাউন্টারে বসে ছিল এক বৃদ্ধ শিখ। বিনা বাক্যব্যয়ে ওরা তার হতভম্ব দৃষ্টির সামনে দিয়ে দোতলায় উঠে গেল। উঠেই ডান দিকে একটা তালা-দেওয়া ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। অরিন্দম বলল, "দূর্বাদি, তুমি পাশের ঘরটা দ্যাখো। খুব সম্ভব দু'ঘরে দু'জন আছে।"

এই সময় হোটেলের মালিক ও একটি জোয়ান লোক ছুটে এল। অরিন্দম ইঙ্গিত করতেই জিত আর পৃথ্বীশ লোকটির দু'পাশে গিয়ে দাঁড়াল। চিতাবাঘের মতো লাফিয়ে উঠে অরিন্দম তার ঘাড়ের নীচে একটা জায়গা টিপে দিল। তৎক্ষণাৎ সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। অরিন্দম ধরে না ফেললে দুম্ করেই পড়ে যেত, মাথায় লাগত ভীষণ। অরিন্দম বলল, "এর নাম 'অ্যানস্থেটিক হোল্ড', এইভাবে তিব্বতে সার্জারি করে ওরা।"

রিভলভার তাক করে হোটেল-মালিককে বলল তিস্তা, "কর্তার সিং, যতই পাকা দাড়ি, পাকা মোচ আর সাদা পাগড়ি লাগাও, তোমায় আমি চিনে ফেলেছি। দরজা দুটো খুলে দাও, নইলে খুলি উড়িয়ে দেব।"

কর্তার সিং কাঁপতে-কাঁপতে পকেট থেকে চাবির গোছা বার করে পরপর দরজাদুটো খুলে দিল এবং পরক্ষণেই একটা হুইসল মুখে পুরে তীব্র ফুঁ দিল। প্রথম ঘরটার মধ্য থেকে অর্ধমৃত মুফিকে ততক্ষণে বুকে তুলে নিয়েছে দূর্বা। দ্বিতীয় ঘরটা থেকে হাত-পা বাঁধা ব্যাচেলকে মুক্ত করে পাঁজাকোলা করে উলটো

দিকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে তিস্তা। সাত-আটজন পুলিশ কনস্টেবল এসে ঘিরে ধরল চার বন্ধুকে।

কর্তার সিং বলল, "এই ছেলেগুলো মাঝরাত্তিরে আমার হোটেলে হামলা করছে। বোর্ডারদের ওপর বিস্তর উপদ্রব করছে খামোখা।"

পৃথ্বীশ বলল, "বেশ তো, চলুন না। আমাদের যা বলবার আছে একেবারে আপনাদের ডি. আই. জি. মিঃ খান্নার কাছেই সব বলব।"

জিতের হাতে যন্তর-মন্তর তখনও ফিসফিস করে চলেছে, 'ডেঞ্জার ডেঞ্জার।'

অরিন্দমকে হঠাৎ কেমন চুপচাপ হয়ে যেতে দেখল জিত। ওর ইঙ্গিতে অফ করে দিল যন্তর-মন্তর। পুলিশি লাঠির ধাক্কায় অসহায়ের মতো উঠে পড়ল কালো ভ্যানে। পুলিশ-ভ্যান যতক্ষণ ওদের থানায় নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণে দেরাদুন-মুসৌরি রোড ধরে তীব্রবেগে ছুটে চলেছে তিস্তাদের ল্যাণ্ডরোভার। স্টিয়ারিংয়ে তিস্তা। পাশে মুফিকে কোলে নিয়ে দূর্বা, পেছনের সিটে শুয়ে আছে র‍্যাচেল। কিছুক্ষণ পরই যে আরএকটা ল্যাণ্ডরোভার ওদের পিছু নিল, লক্ষ করে তিস্তা গাড়ির স্পিড সাঙ্ঘাতিক বাড়িয়ে দিল।

নিজের ঘরে তিনখানা টেলিফোন আর অজস্র ফাইলে পরিবৃত হয়ে বসে ছিলেন মিস্টার খান্না। ওদের চারজনকে দেখে বললেন, "আমার অনুমান ঠিকই মিলেছে তা হলে। এবার শ্রীঘরে বাস করবে চলো চার ওস্তাদ। পয়লা ক্রাইম, অভিভাবকদের ধোঁকা দিয়ে হোস্টেল থেকে একজনের পলায়ন। বাকি তিনজনের কুপরামর্শে এবং সাহায্যে, দুসরা ক্রাইম, মাঝরাত্তিরে ভদ্রলোকের হোটেলে হামলা করা। বাকি ক্রাইমগুলো আস্তে-আস্তে সাক্ষ্য-প্রমাণ সহযোগে যথাসময়ে কোর্টে হাজির করা হবে।"

ওদের কোনও কথা, কোনও কৈফিয়তই শোনা গেল না।

॥ চোদ্দ ॥

মুসৌরির ওয়েসাইড হোটেলে মাঝরাত্তিরে আনন্দ-মজলিস বসেছে। ছোট্ট মুফিয়া তার শাহিন মায়ের কোলে ঘুমোচ্ছে দুধ খেয়ে। শাহিন এক মুহূর্তের জন্যও তাকে কাছছাড়া করতে চাইছে না। ডাক্তারের পরামর্শে ওকে দু'ঘণ্টা অন্তর অল্প-অল্প করে দুধ, ফলের রস ইত্যাদি খাইয়ে যেতে হবে। র‍্যাচেল একটা ডিভানে আধশোয়া হয়ে রয়েছে। তাকে দুধের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি খেতে দেওয়া হয়েছে আপাতত। চিকেন স্যুপ এবং চিপসের অর্ডার গেছে। এমন অবস্থা তার যে, কঠিন খাদ্যবস্তু খুব ধীরে-ধীরে সইয়ে-সইয়ে না খাওয়ালে বমি করে ফেলবে। গায়ের রঙ ফ্যাকাশে। ওজন এত কমে গেছে যে, তিস্তা বলেছে, ওকে পাঁজাকোলা করে বয়ে আনতে একটি বারো-তেরো বছরের মেয়েকে বয়ে আনার চেয়ে বেশি কষ্ট ওর হয়নি।

ফাদার জোনাথন ও জগজিৎ চোপরা এসে ঘরে ঢুকলেন। উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন আলিসাহেব। অরিন্দম এবং অন্যান্যদের ফিরে পাওয়া গেছে এই মর্মে তাঁদের সংবাদ পাঠিয়েছিলেন তিনি। ঘটনাচক্রে হোস্টেলের গেস্টরুমে তখন অবস্থান করছিলেন জগজিৎ চোপরা। ঘটনার জটিলতার কথা তাঁকে কিছু বলা হয়নি। তিনি শুধু জানেন অরিন্দম ক'দিনের জন্য কাউকে কিছু না বলে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন মিস্টার খান্না। চকিতে সবাইকার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর হাত দুটো ঘষতে লাগলেন খুব আত্মপ্রসাদের সঙ্গে।

"বসুন খান্নাসাহেব," বেগম আলি বললেন।

"আমার হেড কোয়ার্টারে খবর গিয়েছিল, সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এসেছি।"

মিঃ খান্না সোৎসাহে বললেন, যেন নিরুদ্দিষ্টদের উদ্ধার করার কৃতিত্বটা ওঁরই।

"তবে এই দুটি মেয়ের অসমসাহসের জন্যেই শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল মিঃ আলি, আপনার নাতি আর এই বোর্ডারটিকে। স্বীকার করতেই হবে। আমার জাল আমি গুটিয়ে আনছিলুম ঠিকই। কিন্তু কম্ম ফতে করেছে মেয়ে দুটি। হ্যাঁ, স্বীকার করতেই হবে," খান্না শেষ পর্যন্ত উদারভাবে বললেন, মিঃ আলির এগিয়ে-দেওয়া কফির পাত্রটা নিতে-নিতে।

র‍্যাচেল বলল, "ঠিকই মিঃ খান্না। আপনি কতদূর এগিয়েছিলেন জানি না। ওরা কিন্তু ঠিক করেছিল মুফিকে কোনও নিঃসন্তান সুইডিশ দম্পতির কাছে অনাথ ভিখিরির বাচ্চা বলে বেচে দেবে। সত্যি-সত্যি ভিখিরি-বাচ্চা ধরলে বাচ্চাগুলোরও সদ্গতি হত, ওদেরও কোনও অসুবিধে হত না। কিন্তু সুইডিশগুলোর কোনও বাস্তব জ্ঞান নেই। ওদের ব্রুনেট অর্থাৎ কালো চুল, কালো চোখ ভারী অপছন্দ। তাই অনেক খুঁজে-খুঁজে ওদের সোনালি বা তামাটে-চুল বাচ্চা ধরতে হত। এরকম শিশু ওরা বহু জোগাড় করেছে ভারতের নানা শহর থেকে। মুফির মতো সোনালি-চুল নীল-চোখ বাচ্চাদের জন্য ওরা বহু ডলার মূল্য পায়। কিন্তু একটা মুশকিল আছে। সুইডিশরা তো চুরি করা বাচ্চা

চায় না। চায় সত্যি-সত্যি অনাথ বাচ্চাদের, যারা ভাল করে খেতে পায় না। ম্যালনিউট্রিশনে ভুগছে। তাই ওরা এই আট দশদিন মুফিকে স্রেফ গ্লুকোজওয়াটার খাইয়ে রেখেছে।

"জানেন খান্নাসাব, জানেন আলিকাকা, আমার বেলায় ওদের ব্যবস্থা ছিল সামান্য অন্যরকম। আমি তো আর বাচ্চা নই যে, কোনও নিঃসন্তান বিদেশী দম্পতি আমায় দত্তক নেবে! তাই ওরা ঠিক করেছিল ওদের ব্যবসার আর-একটা শাখায় আমায় কাজে লাগাবে। আমার পেট-টেট চিরে পাকস্থলী, ইনটেসটিন, লিভার ইত্যাদি সব বার করে নিয়ে সে-জায়গায় ঠেসে দেবে নিরেট সোনা, কিংবা কোকেন, কোন্‌টা আমি জানি না অবশ্য। নাটকটা হল মার্কিন হিপি মেয়ে ইণ্ডিয়া বেড়াতে এসেছিল। সাপ-বাঘ আর বিষাক্ত জলের দেশে বেচারি মারা গেছে স্বাভাবিক ভাবে। তাই তার মৃতদেহ তার বাবা-মা'র কাছে আমেরিকায় ফেরত পাঠানো হচ্ছে, এই আর কি! কী চমৎকার মঞ্চসজ্জা, সিচুয়েশন তৈরির কায়দা বলুন তো?

"দূর্বাদির নিকষ কালো রঙ, তিস্তার বাঙালি চেহারা আর বিখ্যাত মুখের জন্য ওদের দিয়ে এটা সম্ভব ছিল না, তাই-ই আমাকে বেছে নিলেন, না মিঃ খান্না?" সোনালি চুল দুলিয়ে, ফ্যাকাশে ঠোঁটে ঈষৎ হেসে বলল র‍্যাচেল। তার গলায় বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই।

মিস্টার খান্না অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, "ঠিক ঠিক।" পরক্ষণেই প্রচণ্ড উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে দারুণ রেগে চিৎকার করে উঠলেন, "কী, কী বললে তুমি মিস মিডফোর্ড?"

"ঠিকই বলেছি খান্নাসাহেব। জ্ঞান হয়ে থেকে আমাদের কটেজ পিয়ানোর একানব্বইখানা চাবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় কিনা আমার। কান পুরোপুরি তৈরি। পার্টিশনের ওধার থেকেই হোক আর বোরখার আড়াল থেকেই হোক আপনার হেঁড়ে গলা কোন্ সুরে বলে বুঝতে আমার ভুল হয় না। আমার কান কখনও ভুল সাক্ষ্য দেবে না। আমাদের গাড়িটা আপনি শত চেষ্টাতেও ধরে ফেলতে পারলেন না?"

তিস্তা বিদ্যুদ্বেগে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাতে রিভলভার। বলল, "পেছন থেকে দূর্বা মিত্র আপনাকে কভার করছে খান্নাসাহেব, পালাবার চেষ্টা করবেন না। আমাদের চারটি বালক-বন্ধুকে কোথায় রেখে এলেন? এই মুহূর্তে টেলিফোনে তাদের নিরাপত্তা এবং অবিলম্বে এখানে পৌঁছনোর ব্যবস্থা না করলে আপনার সমূহ বিপদ। আপনার মতো ঘৃণ্য, নৃশংস, জানোয়ারের ঠ্যাং চিরকালের মতো

খোঁড়া করে দিলে সরকার নিশ্চয়ই খুশি হয়ে আমাদের যুগল পদ্মশ্রী উপাধি দেবে।"

সামনে তিস্তা পেছনে দূর্বা ঠেলতে ঠেলতে টেলিফোনের কাছে নিয়ে গেল খান্নাকে। দেরাদুন থানায় সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দেওয়ার পরে কাঁপতে-কাঁপতে চেয়ারে এসে বসল খান্না। তারপর ঝাড়া দু-ঘণ্টা প্রতীক্ষা। মধ্যে শুধু একবার হতভম্ব ফাদার জোনাথন জিজ্ঞেস করলেন, "অরিন্দমকে কি সত্যিই পাওয়া গেছে?"

জগজ্জিৎ চোপরা বললেন, "এই বাচ্চাটি আর এই মেয়েটির সঙ্গে অরিকেও কি এরা কিড্‌ন্যাপ করেছিল? আয়্যাম গেটিং কনফিউজ্‌ড্।"

কেউ ওঁদের কথার কোনও জবাব দিল না। র‍্যাচেল অবিচলিতভাবে একটা বিরাট বক্তৃতা দিয়ে এখন নেতিয়ে পড়েছে। তাকে চামচ করে চিকেন স্যুপ খাইয়ে দিচ্ছেন বেগম আলি। তিস্তার নির্দেশে আলিসাহেব ফোন করলেন দিল্লির স্বরাষ্ট্র দফতরে। সেখানকার ফার্স্ট সেক্রেটারি তিস্তার বাবার বন্ধু।

নীচে গাড়ির শব্দ। তারপরই ঘরে ঢুকল চার বন্ধু। সুনৃত ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে বলল, "মাই গড্, য়ু আর সেফ দেন? র‍্যাচেল হোপ য়ু আর ওকে!"

ওরা লক্ষ করেনি জিত তখনও চৌকাঠে। অরিন্দম ঘরে ঢোকেইনি। জগজ্জিৎজি ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "অরি কই? অরি? তুমি নাকি কাউকে না বলে কোথায় গিয়েছিলে? দেখলে তো, দুর্বৃত্তদের হাতে পড়ে তোমার কী হয়রানিটাই হল?"

ওরা সবাই দেখল অরিন্দম হঠাৎ পিছিয়ে যাচ্ছে। মুখে গভীর যন্ত্রণার ছাপ। জিত পাশে গিয়ে দাঁড়াল। অরিন্দম বলল, "জিত, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। একটার পর একটা তরঙ্গ আসছে। সামলাতে পারছি না। প্লিজ, আমায় তোরা ছেড়ে দে।"

টলতে টলতে পিছু হঠতে শুরু করল অরিন্দম। তারপরই মুখ ফিরিয়ে দে ছুট। এত দ্রুত ঘটে গেল ব্যাপারটা যে, বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, কেউ কোনও কথা পর্যন্ত বলতে পারল না। জিত ওর পেছন-পেছন দৌড়ল। পৃথ্বীশ, সুনৃত, চোপ্‌রা, ফাদার জোনাথন। অনেক পেছনে পড়ে আছে লাইব্রেরি বাজার। নির্জন রাস্তা। দু'পাশে শুধু দেওদার। রাতের অন্ধকার মেখে সব নিশ্চুপ।

অনেকটা গিয়ে অরিন্দম দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিসফিস করে বলল, "দূরে ওই ডান দিকে তাকিয়ে দ্যাখ জিত্। ওরা বলেছিল ওরা আসবে। কথা রেখেছে,

ওরা এসেছে।”

জিত দেখল, অনেক দূরে একটা কাচের প্লেটের মতো সাদা আলোর উপবৃত্ত অন্ধকারে ঝকঝক করছে।

অরিন্দম বলল, “আমার তো এক্সট্রা-সেনসরি পার্সেপশন, তার ওপর লামারা সার্জারি করে দুই ভূর মাঝখানে তৃতীয় একটা চোখ খুলে দিলেন। সিক্সথ্ সেন‍স্ও বলতে পারিস। দুষ্ট চিন্তা-তরঙ্গ আগে শুধু অনুভব করতে পারতুম, এখন আর সহ্যই করতে পারছি না। আমাকে চলে যেতে হবে জিত, নইলে এই আমার শেষ।”

ততক্ষণে বাকিরা আরও কাছে এগিয়ে এসেছেন।“ওই দ্যাখ,” বিষণ্ণ গলায় অরিন্দম বলল আবার, “আঙ্কল চোপরা, বানর আর ব্যাঙের সঙ্গে-সঙ্গে আজকাল কোলের ছেলেও চুরি করে চালান দিতে শুরু করেছেন। জ্যান্ত-মানুষের শরীরের কল-কব্‌জা বার করে তার মধ্যে সোনা বা নার্কটিক্‌স্ পুরে বিদেশে পাঠাবার অভিনব ফন্দি বার করেছেন। এই মানুষটি আমার কাকা, আমার একমাত্র আপনজন।” অরিন্দম দু'হাতে নিজের চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরল।

দূর থেকে মৃদু বাঁশির আওয়াজ ভেসে এল। অরিন্দম বলল, “ওঁরা জ্বিবুস নামে বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনও গ্রহ থেকে আমায় নিতে এসেছেন। আঙ্কল চোপ্‌রার ব্যাপারে তোরা যা হয় করিস। আসি জিত। তোর কাছে যন্তর-মন্তরটা রইল। কোনও না কোনও সময়ে...।”

গোল চাকার মতো আলোটার সামনে জিত দেখল, তিনটি অস্বাভাবিক দীর্ঘ কায়া। আলোর বিপরীতে দাঁড়াবার ফলে তাঁদের দেহের কোনও অংশ কিন্তু কালো দেখাচ্ছে না। পুরোপুরি জমাট আলো দিয়ে গড়া যেন। অরিন্দম চিৎকার করে উঠল, “আমার কাছ থেকে সরে দাঁড়া জিত।”

বলতে না বলতেই টর্নেডোর মতো একটা প্রচণ্ড আশ্চর্য হাওয়ার চোঙা অরিন্দমকে প্রায় শূন্যপথে যেন শুষে নিয়ে চলে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিবে গেল আলোর চাকতি। অদৃশ্য হয়ে গেল আলোর মানুষ এবং অরিন্দম। আকাশের অনেক জ্যোতিষ্কের মধ্য দিয়ে শুধু ছুটে চলল আরও একটি জ্যোতিষ্ক ; জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আকাশচিত্রে যার ঠিকানা নেই। ছুটে চলল কোন্ দূর ছায়াপথের উদ্দেশে কে জানে !

মুসৌরির পথের ওপর তখন কতকগুলি বিমূঢ় মানুষকে ঘিরে শেষ রাতের হালকা অন্ধকার।

দ্বিতীয় পৃথিবী

দ্বিতীয় পৃথিবী

আলোর ব্যাঙাচি

গভীর রাত্তিরে যখন পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে যে-যেখানে আছে সব গাঢ় ঘুমে তলিয়ে যায়, তখন পৃথিবীর ক্ষুব্ধমণ্ডলে টুক করে ঢুকে পড়ে ছোট্ট একটা আলোর ফুলকি। বাতাসের সাগরে একটা আলোর ব্যাঙাচির মতো ছটফট করতে করতে ছিটকে ছিটকে ঘুরে বেড়ায়। তার পেট ফুটো করে বেরিয়ে আসে অদৃশ্য শক্তির রেখা। পৃথিবীর বুকের ওপর কী খুঁজে বেড়ায়, তা সেই জানে। বড় বড় অবজারভেটরির শক্তিশালী টেলিস্কোপ লেন্সের পেছনে-বসে-থাকা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের প্রহরারত চোখে কখনও-কখনও ধরা পড়ে এই অভিনব আকাশ-ব্যাঙাচির খেলা। চোখ কচলে আবার যেই লেন্সের ওপর চোখ রাখেন বিজ্ঞানীরা, কিন্তু অজস্র কৃত্রিম উপগ্রহের ভিড়ে কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে পড়ে সেটা। কাভালুর মানমন্দিরে রাত দেড়টায় বিজ্ঞানী রঙ্গনাথন বলেন ছাত্র সুব্বা রাওকে, "আমার চোখটা এবার ভাল করে দেখাতে হবে, বুঝলে রাও। সোজা মাদ্রাজ, আর কোথাও না।"

"কেন সার?"

"চোখের ওপর আলোর স্পট নাচানাচি করছে। এই দেখছি সরু একটা আলোর রেখা সিরিয়াসের পশ্চিম কোণ থেকে বেরিয়ে আসছে। ভাল করে স্টাডি করতে গিয়ে দেখছি ভোঁভাঁ।"

"আজকেও দেখেছেন নাকি সার?"

"অবশ্যই। না হলে আর বলছি কী?"

"আমি একবার দেখছি ভাল করে।"

মিনিট পাঁচ পরে সুব্বা রাও বলে, "সেরকম কিছু তো ঠিক...অবশ্য আমারও ভুল হতে পারে।"

"উহুঁ, ভুল নয়...মানে ভুলই," মাথা নাড়তে নাড়তে রঙ্গনাথন বলেন, "ভুলটা আমার। চোখে আলো নাচানাচি করছে। নির্ঘাত গ্লোকোমার পূর্ব-অবস্থা। রাও, আমাকে কিছুদিন ছুটি নিতেই হবে।"

পশ্চিম গোলার্ধে যখন রাত, তখন সেখানেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। মাউন্ট উইলসন, পালামোর সর্বত্রই এক ব্যাপার। পৃথিবীর বৃহত্তম টেলিস্কোপ আসিমভ লেন্সের পেছনে বসে বিজ্ঞানী ঈগর তাঁর সহকর্মিণী লেডাকেও বলেন কথাটা। "পৃথিবীর কৃত্রিম স্যাটেলাইট চার্টটায় চোখ বুলিয়ে নাও তো একবার। সংখ্যায় একটা যেন বেশি দেখছি!"

আই. এস. সি. অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল স্যাটেলাইট কমিশনের কাছে রিপোর্ট পাঠান ঈগর। কিন্তু রিপোর্ট কর্মাধ্যক্ষের টেবিলে না-খোলা ফাইলে পড়েই থাকে। ব্যাপারটা যে চোখের ভুল নয়, এ-বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন না কেউই। প্রতিদিন নতুন নতুন স্যাটেলাইট যাচ্ছে। আঙ্গোলা, বাংলাদেশ, ওমান পর্যন্ত নিজেদের তৈরি স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছে। নিয়মরক্ষা হিসেবে কমিশনের কাছে একবার খবর পাঠায়, এই পর্যন্ত। ইতিমধ্যে আকাশের এক কৌণিক বিন্দু থেকে আর-এক কৌণিক বিন্দুতে চুপিসাড়ে সরে আসে আলোর ব্যাঙাচি। যেন এক মজাদার কানামাছি খেলায় মেতেছে সে।

শানুর রাত

ঘড়িতে মাঝরাত্তির ঘোষণা করে ঢংঢং করতে দুটো বাজল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘর থেকে অস্বাভাবিক একটা আওয়াজে একসঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল অবিনাশবাবু আর তাঁর স্ত্রী প্রতিমার। অন্ধকারে বিছানার ওপর উঠে বসলেন দুজনে। দুজনেরই চোখে ভয়। ঠিক মাঝরাত্তির। তারপরই শুরু হয়ে গেছে রোজকার মতো পাশের ঘরে শানুর হুড়োহুড়ি। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলেন দুজনে। আগের দিন শানু বিছানায় ক্রিকেট খেলছিল। কখনও বল করছে, কখনও ব্যাট। শূন্য হাতে কী সব কায়দার মার। হুক, লেগ গ্লান্স, স্কোয়ার কাট। আজ শানু বিছানায় শুয়ে শুয়ে পা ছুঁড়ছে শূন্যে ডান বাঁ, ডান বাঁ। তারপর দুটো পা'ই একসঙ্গে। আকাশে টুঁ মারল। তারপরেই খিলখিল হাসি। এবারে সাকার্সের খেলোয়াড়ের মতো দুটো পা দিয়ে দুটো বালিশ লোফালুফি করছে। একটা বালিশ একবার ছিটকে এসে অবিনাশবাবুর মাথার টাকের ওপর ল্যাণ্ড করল। পরক্ষণেই আর-একটা বালিশ এসে ঠিক তার ওপর কোনাকুনি বসে গেল। এবারও শানুর চোখ বন্ধ, কিন্তু ঠোঁট নড়ছে। ভয়ে ভয়ে মুখের কাছে কান নিয়ে গেলেন অবিনাশবাবু। ধারাবিবরণীর মতো কিছু একটা বলে যাচ্ছে শানু, স্থান-কাল-পাত্র বেবাক ভুলে, তার ওপর চোখ বুজে, অর্থাৎ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।

তড়াক করে উঠে পড়ল, একলাফে মেঝেতে প্রতিমা দেবীর পায়ের কাছে। সভয়ে সরে গেলেন তিনি। সারা ঘরে হকি খেলে বেড়াচ্ছে শানু। হাতে স্টিক নেই, বল নেই, তবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এ হকি। দরজার দিকে গেল এবার। আবার ফিরে এল। বিছানায় উঠে পড়ল। মুখসুদ্ধ ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে এবার। একেবারে নিঃসাড়। মুখের চাদরটা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিলেন প্রতিমা। মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ছেলেটার। কেমন যেন গা ছমছম করে উঠল।

নিজেদের দুই ছেলের বিছানা বাধ্য হয়ে পাশের ঘরে নিয়ে গেছেন অবিনাশবাবু। ঠাসাঠাসি করে শুতে হচ্ছে। ভাল করে না ঘুমোলে সকালে পড়াশোনা, স্কুল, খেলাধুলো সব করবে কী করে ছেলেরা? একেক দিন এত হাসে আর এত খেলে শানু ঘুমের ঘোরে যে, তাকে ধরে রীতিমত ঝাঁকাতে হয়। সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো এমন সব জিমন্যাস্টিকের কায়দা দেখাতে থাকে যে, টেবিল, চেয়ার, আলমারি, বইপত্তর সামলাতে প্রাণান্ত হয়।

এই অদ্ভুত ব্যাপারস্যাপার আরম্ভ হয়েছে আজ দিন পনেরো হল। গত বছর শানুর বাবা-মা দুজনেই কী এক অদ্ভুত ভাইরাস-ঘটিত রোগে মারা গেছেন। মামার বাড়ির দিকে ভার নেবার মতো কেউ নেই ছেলেটির। অগত্যা নিজেদের এই ছোট্ট দু'ঘরের ভাড়াবাড়িতে তাকে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন কাকা-কাকি। কিন্তু এনে অবধি তাঁদের শান্তি নেই। একে তো ছেলেটা যাকে বলে বিশ্ব-আকাট। তারপর গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যা শুরু করেছে, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাকা-কাকির চোখে-মুখে কালি পড়ে গেছে।

প্রতিমা দেবী বললেন, "মাথায় জল ঢালব নাকি?"

অবিনাশবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তারপর জ্বর আসুক আর কি তেড়ে!"

কাকি বললেন, "তা হলে ডাক্তার-টাক্তার দেখাতে হবে, নাকি বলো তো?"

কাকা বললেন, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? জ্বর নয়, পেটের অসুখ নয়, ডাক্তার কী করবে?"

"কিন্তু একেক দিন খিল খুলে ফেলতে যায় যে! যদি সত্যি সত্যি বেরিয়ে যায়! জি টি রোড দিয়ে সারা রাত গাঁগাঁ করে লরি যাচ্ছে ভারী ভারী...চালায় যেন দত্যি-দানো...তখন তো পুলিশ-টুলিস নিয়ে নানান হাঙ্গামা!"

অবিনাশবাবুর চোখ সরু হয়ে গেল। একেই কয়েক রাত না ঘুমিয়ে, দুশ্চিন্তায় মেজাজ তিরিক্কি হয়েছিল, বললেন, "তোমার বুদ্ধির গোড়ায় তেল দরকার হয়ে পড়েছে গিন্নি। এ-রোগকে বলে স্লিপ-ওয়াকিং। আমার ছোট ঠাকুর্দাদার ছিল

শুনেছি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একেবারে উইদাউট টিকেট চলে গেলেন কাশীধাম। যখন ঘুম ভাঙল, দেখলেন একেবারে দশাশ্বমেধ ঘাটে আসল এক সাধু মহারাজের পায়ের তলায়। ব্যস, তরে গেলেন। বেরিয়ে গিয়ে এ ছেলের যদি ভাল-মন্দ কিছু হয়েই যায়, তো পুলিশ আমার করবে কী কচুটা। এ রোগের বাপু চিকিৎসা নেই।"

ইতিমধ্যে চোদ্দ বছরের শানু দেখছিল, একটা সুন্দর সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠে সে এই মাত্র তার দলের হয়েশেষ গোলটা দিল। সঙ্গের খেলোয়াড়রা কেউ তার সঙ্গে পেরে ওঠেনি। বলটা আঠার মতো লেগে ছিল তার দু'পায়ের মাঝখানে। ড্রিব্‌ল করতে করতে অনায়াসে সবাইকে পাশ কাটিয়ে সে এগিয়ে গেল গোলপোস্টের দিকে। গোল দিল। আশ্চর্য! কিন্তু বিপক্ষ দলের ছেলেগুলো তাকে ধরে পিটল না তো! সবাই মিলে তাকে মাথায় করে নাচছে। "থ্রি চিয়ার্স ফর শান্তনু রায়, হিপ হিপ হুররে।"

এরকম স্বপ্ন ইদানীং শানু রোজ দেখছে। সকাল হলেই তার মনটা খারাপ হয়ে যায় সেইজন্য। সকাল হলেই জানলা দিয়ে চোখে পড়ে শিশুগাছটা। ওই গাছটার তলাতেই সেদিন তার খুড়তুতো ভাই জিবু-শিবু তাকে ঠেসে ধরেছিল। হাফ-ইয়ার্লির রেজাল্ট নিয়ে ক্লাস-টিচার হরেনবাবু ক্লাসে এলেন। হেঁকে বললেন, "অন্যদের নম্বর-টম্বর এখন থাক। একটি ছেলের নম্বরই শুধু আজ তোমাদের পড়ে শোনাই। ইংরেজিতে পাঁচ, বাংলায় তিন, ইতিহাসে চার, ভূগোলে দুই, বিজ্ঞানে এক, আর অঙ্কে রসগোল্লা।"

"কার সার ? কার সার ?" প্রথমটায় ভয়ে কেউ হাসতে পারেনি। অবশেষে হরেন-সারের গলা ভেসে এল। "পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য এই ছেলেটির নাম শুনতে তোমরা উৎসুক হয়ে রয়েছ। শোনো তবে—এই রেকর্ড মার্কসের অধিকারী হলেন শ্রীমান শান্তনু রায়।" বাস। হাহাহাহা, হোহোহো, হুহুহু। ক্লাসময় হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। হরেন-সার বিজয়গর্বে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন, আর শানুর কপালে, মাথায়, ঘাড়ে-পিঠে ছেলেদের অভিনন্দন পড়তে লাগল। হ্যান্ডশেকের নাম করে হাত মুচড়ে দিল কেউ, মাথায় হাত বুলোবার নাম করে কেউ লাগাল পটাপট গাঁট্টা। "আয় শানু, আয়। কী ভাল ভাল নম্বর পেয়েছিস, একটু আদর করি তোকে।"

এ তো গেল প্রথম দফা। এই শিশুগাছটার তলায় পৌঁছতেই স্কুল-ব্যাগসুদ্ধু জিবু-শিবু দুই খুড়তুতো ভাই ঠেসে ধরেছিল তাকে। আমাদের নাম খারাপ করছিস। লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না ইস্কুলে। মাথায় কী আছে তোর ?"

I/৪৯৯১/৯৫০৪/১৫.৬.১৬৭৮

কী করবে শানু ? তার কি ভাল করতে ইচ্ছে হয় না ? না পারলে কী করবে ? বইগুলো সামনে নিয়ে বসলেই সব যেন পিঁপড়ের সারি। খুদে-খুদে ডিম মুখে নিয়ে কোথাও উধাও। শুধু কি পড়া ? খেলাধুলো ? যা শানু এত ভালবাসে। ব্যাটে বল ঠেকানো শানুর কাছে এক অভাবনীয় ব্যাপার। তার পা থেকে ফুটবল কত সহজে অন্য ছেলের পায়ে চলে যাচ্ছে ; দেখলেও বিশ্বাস করতে পারে না শানু।

যখন বাবা-মা ছিলেন, দিনকাল ছিল অন্যরকম। বাবা স্কুটারের সামনে বসিয়ে স্কুলে দিয়ে আসতেন। আর মা বিকেলবেলা বাসে করে নিয়ে আসতেন। বেশির ভাগ দিনই দিদিমণিরা মা'কে ডেকে ডেকে কী বলতেন। শানু দেখত, মায়ের চোখ ছলছল করছে। সেদিন সন্ধেবেলায় রান্নাবান্না ফেলে মা শানুকে নিয়ে বসতেন। বড় একখানা গুণ করতে শানু কোথাও না কোথাও ভুল করবেই। প্রথমবার, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারের বার ঠিক হতেই মায়ের মুখে হাসি ঠিকরে উঠত।

খবরের কাগজ হাতে বসে বসে সব দেখতেন বাবা। অঙ্কটা অবশেষে ঠিক হতে বাবা বলতেন, "চালাও, কতদিন চালাবে, এভাবে তো যুগ কেটে যাবে।" আর মা যদি অধৈর্য হয়ে ধমক কি পিটুনি দিতেন, বাবা কাগজটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে তাকে কোলে টেনে নিতেন। বলতেন, "ওকে বকছ কেন ? দোষটা কি ওর ?"

সেই বাবা-মা চলে যেতে শানু যেন অথই জলে পড়েছে। কেউ দেখিয়ে দেবার নেই, বলে দেবার নেই। জিবু-শিবুর মাস্টারমশাই দু'একদিন চেষ্টা করে বলে গেছেন, "গাধাকে পিটে ঘোড়া করতে পারি অবিনাশবাবু, সে এলেম আমার আছে, কিন্তু পাথর পিটিয়ে কি আর মানুষ হয় ?"

ক'দিন হল শানু স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। কী সুন্দর সুন্দর জায়গা। সুন্দর সুন্দর মানুষ। সবার মুখে প্রাণ জুড়ানো হাসি, কী ভাল ভাল খাবার, সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হল, শানু খেলছে। ফুটবল, হকি, টেনিস, ক্রিকেট। দারুণ খেলছে সে, হাত-পা যেন চালাতে চাইছে, তেমনি চলছে। এক-একটা লাফ দিচ্ছে, চার-পাঁচ হাত ওপরে অনায়াসে উঠে যাচ্ছে। কী সহজ অঙ্ক। একজন ডুবুরির মতো দেখতে মাস্টারমশাই কী সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে মাথায় বসে গেল জিনিসটা। স্বপ্ন যদি সত্যি হত।

ওরা ক'জন

একটা নিচু গোল ঘর। ঘরের মধ্যে মৃদু আলো। মাঝখানে একটা টেবিল। ঘরের ছাদ থেকে শক্তিশালী আলোর রেখা এসে পড়েছে তার ওপর। টেবিলটা ঘিরে বসে ছিলেন জনাছয়েক ছোট ছোট মানুষ। মাথায় সবুজ হেলমেটের মতো টুপি পরা। মুখে মুখোশ। অদ্ভুত ধাতুতে তৈরি পোশাক তাঁদের গায়ে। টেবিলের ওপর একটা মানুষের পুরো নার্ভাস সিস্টেমের ছবি। মানুষগুলি অদ্ভুতদর্শন ছোট ছোট কতগুলি যন্ত্র দিয়ে সেই ছবিটার ওপর যেন কাটাকুটি খেলছিলেন। কখনও কোথাও একটু এঁটে দিচ্ছেন। কোথাও একটু খোঁচা, কখনও বোতাম টিপে দেবার মতো টিপে দিচ্ছেন। সামনে একটা টেলি-পর্দা। সেখানে একটি ছোট ছেলের চেহারা দেখা যাচ্ছে। ছেলেটি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ডিফারেনশ্যাল ক্যালকুলাস কষে যাচ্ছে। লোকগুলি কাজ করতে করতে মাঝে-মাঝেই টেলি-পর্দার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। একজন আর-একজনকে বললেন, "গ্লিয়া সেলগুলো সারাই-ঝালাই হয়ে গেছে। ওর মেমারিতে আর কোনও গণ্ডগোল নেই। ধারণ-ক্ষমতা একশোগুণ বেড়ে গেছে বলেই আমার গণনা। এবার কী করব লে?"

লে বললেন, "মোটর-এরিয়া সম্পর্কে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই তো চি?"

চি বললেন, "না। ও আপাতত মাটি থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট পর্যন্ত লাফিয়ে উঠে চারটে পর্যন্ত ডিগবাজি খেতে পারছে। দুটো হাত, দুটো পা'ও একসঙ্গে চালাতে পারছে না। এই ক্ষমতা একটু অনুশীলনে আরও বাড়বে।"

লে বললেন, "বন্ধুগণ, এবার বাকি সেলগুলোর কাজ আরম্ভ করো। এস-এর অসুবিধেগুলো যে ধরনের, তাতে সোমেসথেটিক এরিয়ার ওপর আরও সাজারি দরকার হবে।"

ছোট্ট-ছোট্ট যন্ত্রগুলো নিয়ে ছবিটার ওপর প্রায় উপুড় হয়ে পড়লেন বাকি চারজন।

শ্রীমান শান্তনু রায়, হিপ হিপ হুররে

আজ শানু স্কুলে যায়নি। খুব জ্বর আসছে তার। মুখখানা গনগনে লাল। ভাইয়েরা বেরিয়ে গেল। কাকি তাকে এক গ্লাস বার্লি দিয়ে গেলেন। অবিনাশবাবু বলে গেছেন, "স্টার্ভ এ ফিভার, ফিড এ কোল্ড। দু'দিন উপোস করিয়ে রাখো, দেখবে জ্বরের বাবা পালিয়ে যাবে।"

জ্বরের ঘোরে শানু শুনল, কে যেন তাকে অনেক দূর থেকে ডাকছে। "এদিকে দ্যাখো শানু, ভয় পেয়ো না!"

কতকগুলো মুখোশপরা মানুষ, একটা মৃদু আলোয় ভরা ঘর...। শানুর মুখের দিকে তাকিয়ে কাকির কেমন ভয় হল। গনগন করছে মুখখানা। থার্মোমিটার লাগিয়ে দেখলেন, একশো সাত ডিগ্রি।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না ভদ্রমহিলা। একশো সাত? ও কি বেঁচে আছে? এক্ষুনি তো মরে যাবে। মাথায় বরফের পুঁটলি চাপিয়ে তক্ষুনি ছুটলেন পাশের বাড়ি থেকে অবিনাশবাবুকে ফোন করতে।

ছুটি নিয়ে বাড়ি আসতে অবিনাশবাবুর এক ঘণ্টা। ততক্ষণ সমানে মাথায় জল ঢালছেন আর বরফ চাপাচ্ছেন প্রতিমা দেবী। অবিনাশবাবু আসতে বললেন, "থার্মোমিটার দাও দেখি! কী দেখতে কী দেখেছ!" থার্মোমিটারটা শানুর বগলে ধরতে পট করে একটা শব্দ হয়ে কাঁচ ফেটে পারা বেরিয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন দুজনে।

ডাঃ ভৌমিক যখন এলেন তখন শানুর টেম্পারেচার আস্তে আস্তে নামছে। নামতে নামতে ০° ডিগ্রির তলায়। কিন্তু নাড়ি চলছে। শরীর গরম। চোখের পাতার তলায় মণি কাঁপছে। ডাঃ ভৌমিক পায়ের তলায় গরম জলের বোতল ঘষতে ঘষতে বললেন, "ভৌতিক ব্যাপার! আমি এরকম কখনও দেখিনি। কোনও নতুন ধরনের ভাইরাস...আমি চললাম।"

বললেন বটে, কিন্তু ডাঃ ভৌমিককে বসতে হল। কারণ এই সময়ে শানু পাশ ফিরল। ভৌমিক বললেন, "টেম্পারেচারটা আর-একবার নিন তো!" নিজের ব্যাগ থেকে আধুনিকতম যন্ত্র বার করে দিলেন ডাক্তার। সেটা লাগাতেই চমকে উঠলেন অবিনাশবাবু। রোগীর শরীরে আবার তাপ ফিরে এসেছে। "নাইনটি এইট পয়েন্ট ফোর।" ডাক্তার নিজেই পড়লেন। বিমূঢ় চোখে চেয়ে থেকে থেকে বললেন, "খাওয়াদাওয়া এখন লিকুইড ছাড়া কিছু দেবেন না। টেম্পারেচার রেকর্ড করে রাখুন চার ঘন্টা অন্তর অন্তর। ওষুধ কিছু দিচ্ছি না। শুধু ভিটামিনটা রেগুলার...।"

অদ্ভুতদর্শন আকাশযানের মধ্যে হান্ নামক মানুষটি বললেন, "লে, অপারেশন সেন্ট পার্সেন্ট সাকসেসফুল, সেরিব্রামটাকে প্রায় ঢেলে সাজানো হয়েছে। এবার?"

লে বললেন, "এস-এর প্রোগ্রেস ঠিকমতো হচ্ছে কি না দেখা দরকার। উইল পাওয়ার কাজ না করলে কিন্তু রি-অপারেট করতে হতে পারে। কা, তুমি নজর রাখো।"

ঘুম ভেঙে উঠে শানুর মনে হল অস্বাভাবিক ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। এত ভাল লাগছে যে, এমন অভিজ্ঞতা তার আগে কখনও হয়েছে বলেই মনে করতে পারল না শানু। শিশুগাছটার ওপর একটা কালো লেজঝোলা পাখি মোটা পেটটা দুলিয়ে দুলিয়ে শিস্ দিচ্ছে। আকাশটা ঘষা কাচের মতো। তবু এক ঝলক রোদ পুব কোণ থেকে ঘরের কোনাকুনি জানলার সার্সির ওপর আছড়ে পড়েছে। কম্বলটা সরিয়ে শানু তড়াক করে লাফিয়ে নামল। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে বিশাল একটা আড়মোড়া ভাঙল। আঙুলের গাঁটগুলো পটাপট টিপে দিল। তারপরেই পেটের মধ্যে লাফিয়ে উঠল খিদে। দেখল, কী রকম অদ্ভুত চোখ-মুখ করে কাকা-কাকিমা দাঁড়িয়ে আছেন চৌকাঠের কাছে।

"শিগগির কিছু খেতে দাও কাকিমা, পেটে আগুন জ্বলছে।"

শুনে, কাকিমা কেমন যেন ভড়কে গিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেলেন। মনে হল, যেন ভূত দেখলেন। দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে ঘরে আসতেই শানু দেখল ডাক্তারবাবু বসে। তাঁরও চোখে-মুখে সেই অদ্ভুত দৃষ্টি।

"খেতে দিলে না কাকিমা?" মুখটা গামছা দিয়ে মুছতে মুছতে শান্তনু বলল।

ডাক্তারবাবু বললেন, "দিন, দিন, যা চায় দিন। কী খাবে খোকা?"

শানু বলল, "মুরগি, মটন, কোপ্তা, কাবাব, রুটি, আলুচচ্চড়ি, বেগুনপোড়া, মুড়ি-গুড়..."

থামিয়ে দিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, "সবগুলোই একসঙ্গে খাবে?"

"উঁহু," মজার মুখ করে শানু বলল, "কাকিমা'কে একটা ওয়াইড চয়েস দিলুম। যেটা সামনে আছে, সেটাই আনতে পারবে চট্ করে।"

তারপরেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠল শানু, "স্কুলের সময় হয়ে গেছে, আমি স্নানে যাচ্ছি, কাকিমা, খাবার রেডি করো।"

ডাক্তার হতভম্বের মতো বসে ছিলেন। অবিনাশবাবু বললেন, "ওকে কি ভূতে পেয়েছে?"

ডাক্তারবাবু বললেন, "আনসায়েন্টিফিক কথা বলবেন না মশাই।"

"তা কী বলব তা হলে? কালকের ঘটনা তো নিজের চোখেই দেখলেন। তারপর এখন এই। এ ছেলে এভাবে কখনও চলেওনি, বলেওনি।"

"এর কেস-হিস্ট্রিটা আমাকে ভাল করে তৈরি করে দেবেন তো আজ চেম্বারে

গিয়ে।" চিন্তিত মুখে ডাঃ ভৌমিক চলে গেলেন।

ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে দুলকি চালে স্কুলের দিকে চলেছিল শানু। তাড়া নেই। বেশ সময় হাতে নিয়েই বেরিয়েছে সে। রাস্তাটা ভাল করে দেখতে দেখতে চলেছে। কী সুন্দর আকাশটা আজ। সকালবেলার সেই ঘষা-ঘষা ভাবটা একদম নেই। চষা খেতের মতো মেঘ জুটেছে আকাশময়। মেঘের পেছন থেকে রোদ্দুর ঠিকরে বেরোচ্ছে বলে আলোটায় কেমন একটা মায়া। স্কুলের পেছন দিকে শানুর কাকার বাড়ি, সে পেছন দিক দিয়েই আসে, বড় রাস্তায় পড়ে, তারপর স্কুলের মুখোমুখি হয়। হঠাৎ পাশের একটা সরু গলি থেকে তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে এল তিনটে ছেলে। নিতাই, রজ্জব আর শ্রীহরি। শানুর তিন দুশমন। ক্লাসের অন্য ছেলেরাও তার পেছনে লাগে, কিন্তু এই তিনটে একেবারে আস্ত শয়তান। সবসময়ে পেছনে ফেউ লেগে আছে যেন। বিচ্ছু তিনটে পেছন থেকে তাকে জব্দ করতে আসছে। চোখের কোণ দিয়ে একবার দেখে নিল শানু। কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছতেই হঠাৎ শানু লাফিয়ে উঠে কী একটা কায়দা করল কে জানে, দেখা গেল, তিনজন তিনদিকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে। দু'জন খোঁড়াতে খোঁড়াতে, আর একজন মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে।

মৃদু স্বরে শিস দিতে দিতে স্কুলে পৌঁছে লাস্ট বেঞ্চে নিজের জায়গায় ব্যাগ রেখে একটা বই খুলে বসল সে।

স্পাস্টিক্স হোম

পুনের খড়কি অঞ্চলে অনেকটা জায়গা নিয়ে এই বাড়ি। বাগানে প্রচুর ফুল। এখন রাত বারোটার সময়েও হলুদ গাঁদা, কসমস আর ডালিয়ায় আলো হয়ে আছে জায়গাটা। বাড়িটি একটি 'স্প্যাস্টিক্স্ হোম'। সেরিব্র্যাল পলসি রোগে যে-সব শিশুর চলাফেরার কাজ করার ক্ষমতায় নানারকম ত্রুটি আছে, তারাই এখানে থাকে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অতি ধৈর্যের সঙ্গে এদের শিক্ষা দেওয়া হয়। এর একটি অংশ আছে শুধুই মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য। এই হোমের দোতলার একটি ঘরে মিটিং বসেছিল। ডাঃ ব্রহ্ম, ট্রেনড্ টিচার মিস কঙ্কাবতী ভট্টাচার্য, মেট্রন শুভলক্ষ্মী এবং অধ্যক্ষ সুব্রমনিয়ন। বিশেষ করে মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়েই আজকের মিটিং।

মেট্রন শুভলক্ষ্মী বললেন, "নীতা সিং একাই নয়, এই সিমটম আরও জনাসাতেকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে।"

ডাঃ ব্রহ্ম বললেন, "আমি কিন্তু এখনও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না ব্যাপারটা ।"

সুব্রমনিয়ন বললেন, "আমিও করিনি । মেট্রন একদিন দৈবাৎ দেখে ফেলেন ব্যাপারটা । পরপর কয়েকদিন ওয়াচ করবার পর আমাকে খবর দেন । এখন দেখছি সিমটম অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে ।"

ব্যাপারটা হল, এই হোমে নীতা সিং নামে এক গুরুতর মানসিক প্রতিবন্ধী কয়েক মাস হল ভর্তি হয়েছে । ভাল করে কথাও সে বলতে পারে না । কোনওরকমে, জড়িয়ে-জড়িয়ে, কিছু উচ্চারণ করে মাত্র । মেয়েটির বাবা-মা নেই । ইন্দোরের সম্পন্ন পরিবারের মেয়ে । কিন্তু বাবা-মা না থাকায় এইরকম মেয়ের দায়িত্ব আত্মীয়রা কেউ নিতে চায়নি । খোঁজখবর করে মেয়েটিকে তারা এই হোমে দিয়ে যায় । মেট্রন শুভলক্ষ্মী গত সপ্তাহে একদিন রাতে ওদের ওয়ার্ডে গিয়ে লক্ষ করেন, নীতার বেড থেকে কেমন একটা আওয়াজ আসছে । আওয়াজ লক্ষ করে এগিয়ে গিয়ে দেখেন, নীতা মেয়েটি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে । ভাষা পরিষ্কার । ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করতে গিয়ে মেট্রন দেখেন, জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে । তিনি আয়াদের ডেকে জ্বর কমাবার বড়ি দিতে নির্দেশ দেন, মাথায় জল-টলও দেবার ব্যবস্থা করেন । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরদিন ডাক্তারসমেত খোঁজখবর নিতে এসে দেখেন, জ্বর তো নেই-ই, মেয়েটি খুব স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে, হাসছে, চোখের দৃষ্টিটাই যেন বদলে গেছে ।

এই জিনিস ধীরে ধীরে আরও কয়েকজন বোর্ডারের ক্ষেত্রেও ঘটতে থাকে । হবিব ও নিলোফা নামে দুটি উত্তরপ্রদেশীয় মুসলিম ছেলে-মেয়ে, সুন্দরন নামে একটি তামিল ছেলে, জংবাহাদুর নামে একটি নেপালি, এবং পিঙ্কি ও নীরজ নামে দুটি গুজরাতি মেয়ে । সকলেই মানসিক প্রতিবন্ধী । কারওই অভিভাবক বলতে কেউ নেই । রাত্তিরে এদের প্রবল জ্বর হয়, সেটা সকালেও থাকে এক-এক সময়, তারপর জ্বর ছেড়ে যাবার পর ছেলেটি বা মেয়েটি আগের চেয়েও সুস্থ, লক্ষণীয়ভাবে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকে ।

মেট্রন শুভলক্ষ্মী বললেন, "এই ছেলেমেয়েগুলো হঠাৎ স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের মতো ব্যবহার করছে । নীতার কথাই ধরুন । প্রায় হাবাগোবা ছিল, হঠাৎ বুনতে আরম্ভ করেছে প্রচণ্ড বেগে । কথা অবশ্য সেই একদিন প্রলাপের ঘোরের পর থেকে আর বিশেষ বলেনি । হবিবের হাতের লেখা ছিল কাগের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং । কিছুদিন হল লিখে যেন মুক্তোর সারি । একটা বানান-ভুল নেই । এ সমস্তই আমার কাছে আশ্চর্য ।"

অধ্যক্ষ বললেন, "কেন ? মিস্ ভট্টাচার্যের ট্রেনিংয়ের ফলে হচ্ছে বলে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করতে পারছেন না কেন ?"

শুভলক্ষ্মী এবং কঙ্কাবতী ভট্টাচার্য একই সঙ্গে বলে উঠলেন, "না, মিঃ সুব্রমনিয়ন । এভাবে এসব জিনিস হয় না । এদের আসল বয়স কারও চোদ্দ, কারও ষোলো হলেও মেণ্টাল এজ এদের শিশুর মতো । কত ধৈর্যে, কত চেষ্টায় এদের দিয়ে সামান্যতম কাজ করানো যায়, সে আমরাই জানি ।"

হোমের ভেতরের দিকের একটা ঘরে আরেকটা কনফারেন্স বসেছিল । তফাতের মধ্যে এটা ছোটদের । এই দলে আছে নীতা, সুন্দরন, জংবাহাদুর, নিলোফা, পিঙ্কি, হবিব ও নীরজ । নীতা নিচু গলায় বলল, "কী রে হবিব, ভালমানুষটি সেজে আছিস কেন ? জবাব দে । তুইও তো স্বপ্ন দেখিস । দেখিস না ?"

একটা রাতচরা পাখি কোথায় কটর-কটর করে ডেকে উঠল । হবিব অনিচ্ছুক গলায় বলল, "তুই কী করে জানলি ?"

"তোর ধরন-ধারণ দেখেই বুঝেছি । আমার বেডের মুখোমুখি তোদের ঘরের দরজাটা । লুকোবি কী করে ? রাত্তিরে মেট্রনের দেওয়া ওষুধটা জানলা গলিয়ে ফেলে দিস । তারপর সকালে উঠে সমানে চোখ কচলাতে থাকিস, আর জানলাটার দিকে তাকাস । কে আসে রে জানলা দিয়ে ?"

পিঙ্কি বলল, "হুঁহুঁ বাবা ! চেপে যাবি মনে করেছিলি তো ? কী রে নিলোফা, তুই তো আমার একটা খাট পরেই শুস । কিচ্ছু টের পাইনি ভেবেছিলি, না ?"

সুন্দরন আর জংবাহাদুর বলল, "আমরাও স্বপ্ন দেখি রে ! ব্যাপারটা কী বল তো !"

নীতা বলল, "আগে বল কী দেখিস ?"

"দেখি কি, সুন্দর একটা কাচের ঘর..."

"কাচ নয়, ওটা সিল-থ্রি ।" নীতা গম্ভীরভাবে বলল ।

"সে যা-ই হোক, তারপর দেখি কতকগুলো লোক, একটা মেয়েও আছে তার মধ্যে..."

নিলোফা বলল, "কারা যেন আসছে, চুপ !"

সঙ্গে সঙ্গে সাতটি ছেলেমেয়ে বিছানার মধ্যে এবং তলায় ডাইভ খেল । সুন্দরন, জংবাহাদুর আর হবিব খাটের তলায়, কেননা ছেলেদের ওয়ার্ড প্যাসেজের উলটো দিকে । ধরা পড়লে পিটুনি খেতে হবে ।

জুতোর মসমস শব্দ করতে করতে ঘরে ঢুকে এলেন ডাঃ ব্রহ্ম, অধ্যক্ষ সুব্রমনিয়ন, তাঁদের পেছনে-পেছনে মেট্রন ও মিস ভট্টাচার্য। নীতার বিছানার কাছে গিয়ে কপালে হাত দিয়ে, চোখ টেনে, হাঁটুতে হাতুড়ি ঠুকে কী সব পরীক্ষা করলেন ডাক্তার, তারপর একে-একে বাকি মেয়েগুলোর বিছানার কাছেও গেলেন। ফিসফিস করে বললেন, "জ্বর-টরের তো কোনও লক্ষণই দেখছি না, টেম্পারেচার, পাল্‌স্ বিট, সবই নর্ম্যাল।"

শুভলক্ষ্মী বললেন, "একবার ই. ই. জি. নিলে হয় না?"

ব্রহ্ম বললেন, "সে তো আমরা বছরে দু'বার করে নিয়ম করেই নিই। তা ছাড়া ই. ই. জি.-ও তো খুব নির্ভরযোগ্য নয়!"

শুভলক্ষ্মী বললেন, "আপনাকে যদি ঠিক সেই সময়টায় ডেকে আনতে পারতুম!"

"এবারে তা-ই করবেন।" নীরস গলায় ডাক্তার বললেন। রাত বারোটায় সুব্রমনিয়নের নির্দেশে উঠে আসতে হয়েছে তাঁকে। মেজাজ বিশেষ ভাল নেই।

"আরেকটা কাজ করতে পারেন ডাঃ ব্রহ্ম, সকালবেলা এদের ওয়ার্করুমে গিয়ে কাজের নমুনাগুলো দেখে আগেরগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন। তাতে করে হয়তো বুঝতে পারবেন আমরা কী বলতে চাইছি।"

মসমস করতে করতে আবার বেরিয়ে গেল দলটা। করিডরের ওপর জুতোর শব্দ মিলিয়ে যেতে আবার লেপের তলা থেকে, খাটের তলা থেকে লাফিয়ে উঠল সাত মূর্তি। নীতা লিডার। বলল, "ওষুধ খাইয়ে বেচারাদের কীরকম ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে দ্যাখ। আমাদের কিন্তু এতক্ষণ কনফারেন্স করে সাঙ্ঘাতিক খিদে পেয়েছে। চ, রান্নাঘর থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য ম্যানেজ করা যাক।"

বাকি সবাই নীতার পেছন-পেছন চলল। হোমের রাঁধুনি, চাকর সবাই যে যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। শিকারি বেড়ালের মতো সন্তর্পণে রান্নাঘরে ঢুকল সাতজনে। রাত একটার ডিনারটা ভালই হল বলতে হবে। ফ্রেঞ্চ টোস্ট, আলুভাজা আর মটরশুঁটি সেদ্ধ। আর কিছু হাতের কাছে পায়নি ওরা। শীতটা জাঁকিয়ে পড়েছে, সুতরাং সবাইকার জন্য এক কাপ করে গরম-গরম কফি বানাল হবিব। ধুয়ে মুছে সব সাফ করে আবার ঘরে এসে নীতা আর নিলোফার খাটে ভাগাভাগি করে বসল সবাই। নিলোফা বলল, "আমাদের কিন্তু খুব সাবধানে থাকতে হবে কিছুদিন। ওদের বুঝতে দিলে চলবে না।"

নীতা বলল, "তোদেরও তা হলে একই পরামর্শ দিয়েছে, ভাল করে খুলে বল তো ব্যাপারটা।"

হবিব বললে, "স্বপ্নের মধ্যে যে লোকটা আসে, সবুজ হেলমেট আর প্ল্যাস্টিক না কিসের জামা পরা, সে বলে, 'হবিব, এটা স্বপ্ন নয়, সত্যি। তোমাদের একটা অসুখ ছিল, ডাক্তারেরা কেউ সারাতে পারেনি, আমরা পেরে গেছি।' আমি বললুম, 'তোমরা কি তা হলে ডাক্তার নও?' লোকটা হাসল, কী সুন্দর হাসিটা! বলল, 'আমরা হিউম্যান টেকনোলজিস্ট। তোমাদের বুদ্ধি, শারীরিক ক্ষমতা, স্মৃতি, সব কিছুই অন্যদের থেকে অনেক-অনেক বেশি হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা এখন অন্যদের কাছে প্রকাশ করা চলবে না। আমাদের কাছ থেকে সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত যেন কিছুই জানো না, কিছুই বোঝো না, এমনি ভান করে থাকবে।' তোদের সবার নাম বলল লোকটা। তোদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলল। আচ্ছা, লোকটার কোনও খারাপ মতলব নেই তো?"

নীতা বলল, "যে লোকের ওরকম দুঃখী-দুঃখী মুখ আর মিষ্টি হাসি হয়, সে কখনও খারাপ হতে পারে?"

জংবাহাদুর ভারী গলায় বলল, "খুব ভাল লোকটা। সুব্রমনিয়নের মতো নয়।" জংবাহাদুর খুব গোঁয়ার বলে মাঝে-মাঝেই অধ্যক্ষের কাছে পিটুনি খায়। "আচ্ছা, আমাদের কী অসুখ ছিল বল তো, যেটা ওরা সারিয়ে দিল?"

নীতা পাশের খাটটা দেখিয়ে দেয়। নীলম ঘুমোচ্ছে অঘোরে। বলে, "ওরই মতো ছিলাম নাকি আমরা। এবার দেখা হলে সবুজ ডাক্তারকে বলব নীলমকেও ভাল করে দিতে। শুধু নীলম কেন, আত্রেয়ী, সুদেশ, পরভিন সব্বাইকে।"

বলতে বলতে নীতার চোখে জল এসে গিয়েছিল। নীরজ বলল, "নীতা, ওয়ার্করুমে সাবধান কিন্তু। কঙ্কাবতীদি তোমার ওপর নজর রেখেছেন। ওঁরা কিন্তু বারণ করেছেন। ওঁরা যা বলবেন আমরা শুনব।"

পুনের আকাশে আলোর ফুলকিটা হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেল। ভেতরে কা বললেন, "ওঃ লে, সাঙ্ঘাতিক খাটিয়েছ, আমার দু'চোখ জুড়ে স্বাভাবিকভাবে ঘুম নেমে আসছে। চোখের মধ্যে শুধু সাদা আর ধূসর কিলবিল করছে। প্রত্যেকটা লোব তন্ন-তন্ন করে সাজারি করা কি চাট্টিখানি কথা!"

ক্রিটো বললেন, "আর, আমাদের অনভ্যাসও হয়ে গিয়েছিল খুব। যাক, লে ছিলেন..."

ঘরভর্তি মৃদু সবুজ-আলোর মধ্যে মস্ত একটা হাই তুলে হাওয়া-বালিশে মাথা দিয়ে লে আস্তে আস্তে বললেন, "মিশন সাকসেসফুল হলে তবেই তো..."

শানু বনাম স্কুল

ইতিহাসের ক্লাসে শানু প্রতিদিন দাঁড় খায়। তাকে সাধারণত খুব মামুলি প্রশ্ন ধরেন মাস্টারমশাই। আজকে পটাপট সেগুলো বলে দেওয়ায় মহীতোষদা-সার চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকে নিরীক্ষণ করলেন, তারপর বললেন, "একটু মন দিয়ে চেষ্টা করলেই তো পারো বাছাধন, আমার শেখাবার টেকনিকটাই আলাদা তো! একটু ফলো করলে আর...তা এতদিন তোম্বা মেরে ছিলে, আজকে যে বড় অতগুলো ডেট গড়গড় করে বলে গেলে? বলি ব্যাপারটা কী হে গবেটচন্দ্র খাসনবিশ!"

শানু বলল, "ওটা কোনও ব্যাপারই নয়। আসলে যে-সব ডেট-টেট নিয়ে আপনারা মাথা ঘামান সার, আমি সেগুলো নিয়ে মোটেই ভাবি না। তবে নেহাত যদি জানতে চান, মাথার খোপ থেকে টেনে-টেনে বার করে আনতে হয়..."

"আচ্ছা!" মাস্টারমশাই বেশ খানিকটা অবাক হয়েছেন বলে মনে হল। "তা ডেট না হয় আনইমপর্ট্যান্ট! আকবরের সভার তিনজন নামকরা হিন্দু সভাসদের নাম বলতে পারো?"

"কেন, সেনাপতি মানসিংহ, বিদূষক বীরবল আর রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল।"

মহীতোষদা-সার শানুকে পেটাতে না পেরে খুব বিষণ্ণ মুখে ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

টিফিন পিরিয়ডটা ক্লাসের ছেলেদের মজা করার সময়। এটা ওরা সমবেত ভাবে, খেপে খেপে করে, করে একমাত্র শানুকে নিয়েই। টিফিন খেতে দেয় না। ল্যাং মারে, অকথ্য সব নাম বানায়। আজ রজ্জব, নিতাই, শ্রীহরিকে ধারে-কাছে দেখা গেল না। শ্রীহরির মাথায় ছোট্ট একটি আলু। রজ্জবের বাঁ পা মচকেছে, নিতাইকে বোধহয় বাড়িই চলে যেতে হয়েছে। বড্ড খোঁড়াচ্ছিল।

শানু যেখানে বাঁধানো অশত্থতলায় বসে একা-একা চার আনার ঝালমুড়ি খাচ্ছিল, সেখানে দ্রুতগতিতে পৌঁছে গেল অলক, বিজয় আর প্রদীপ। নিতাইদের ঘটনা ওরা জানে না। শ্রীহরির মাথার আলুটা নজরে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু ওদের জিজ্ঞাসার কোনও সদুত্তর দেয়নি শ্রীহরি, এড়িয়ে গেছে।

প্রদীপ বলল, "আরে আরে, আমাদের টোডরমল্ল-সাহেব রাজসভা ছেড়ে এসে, মোগলাই খানাপিনা ছেড়ে কিনা মুড়ি খাচ্ছেন? বাবা টোডরমল, মুড়িতে যে ভেজাল তেল, কাবলি মটরে পোকা, গুচ্ছের ঝাল, ওগুলো খায় না, ছিঃ। আকবর বাদশা গোঁস্‌সা হবেন টোডর।"

কথা শেষ হতে না হতেই বিজয় ঠোঙাটাতে লাথি ঝাড়ল। শানু ব্যাপারটার জন্য তৈরি ছিল, ওদের দেখেই ভাল করে মুড়ে নিয়েছিল ঠোঙাটা। বিজয়ের মারাত্মক শটে ঠোঙাটা বোঁ করে ছ'ফুট উঁচুতে উঠে গেল। তারপর সোজা আবার শানুর হাতের ওপর নেমে এল। বিজয় বলল, "পায়ের শট দেখেছিস! ইন্টারস্কুল সকারে এবার চ্যাম্পিয়ানের শিল্ডটা নিয়ে আসছিই।"

পরক্ষণেই প্রদীপের পা উঠে গেল ধাঁ করে, শানুর মুড়ির ঠোঙা আবার ছ'ফুট উঁচুতে। একটা কাঠবেড়ালি অশত্থের ডালপালার মধ্যে থেকে উঁকি মেরে দেখছে সেটাকে। শানুর মন এখন প্রাণপণ শক্তিতে মুড়ির ঠোঙাটাকে শূন্যে থামিয়ে রেখেছে। দু'তিন সেকেণ্ড। তারপরেই অক্ষত ঠোঙাটা আস্তে-আস্তে তার দু'হাতের মধ্যে নেমে পড়ল। শানু একমুঠো মুড়ি গালে পুরে উলটোদিকে হাঁটা দিল, যেন কিছুই হয়নি। তার দিকে ভ্যাবাচ্যাকার মতো একবার চেয়ে ছেলে তিনটি লম্বা দিল।

গোলমতো আকাশযানে কা নামের মহিলা লে নামের ব্যক্তিকে বললেন, "এস-এর ইচ্ছাশক্তি ঠিকঠাক কাজ করছে লে...এবার আমরা..."

লে'র মুখে খুশির হাসি ফুটে উঠল। তাঁদের বড্ড তাড়া। একটা কাজ হয়ে গেলেই পরের কাজ। বসে থাকবার সময় নেই। বড্ডই তাড়া!

দাদু-দিদা

আকাশমণির ঠাকুর্দার বয়স তিয়াত্তর। একটা চোখে পুরো ছানি, আরেকটাতেও পড়তে আরম্ভ করেছে। কানে ভাল শুনতে পান না। সারাটা জীবন কেটেছে দেশে-ঘরে, এখন সব ছেলেরা শহুরে হয়েছে। বুড়ো বাপকেও শহরের গলিতে দিন কাটাতে হয়। শীতকাল। সারাদিন ছাদের একচিলতে রোদটুকুতেই বসে থাকেন, আর জাবর-কাটার মতো কার সঙ্গে যেন গল্প করেন। "আগুতে যা-ই বলো বাপু, এমনিধারা ঠাণ্ডা ছেল না, কস্মিনকালে এই এতগুলো গরমজামা পরতে হয়নি! যতই দিন যাচ্ছে, ততই শীতের কামড় বাড়ছে হরি, উ হুহুহু।"

আকাশমণি শুনতে পেলে বলে, "সে কী গো দাদু, মাঘ মাস যে পুইয়ে এল, ঠাণ্ডা কোথায়?"

ঠাকুর্দা বিড়বিড় করে বলতেই থাকেন, "আগুনে আমরা এমনি শীতে সামান্য একটু দোলাই গায়ে দিয়ে নতুন জ্বাল দেওয়া ঝোলাগুড়ের সঙ্গে গরম-গরম

ডাঁটো-ডাঁটো মুড়ি চিবোতুম, খোলা থেকে সোজা-কাঁসার জামবাটিতে ঢেলে দিত তোদের ঠাকুমা।"

"তুমি দোলাই গায়ে দিয়ে মুড়ি খেতে আর আমার ঠাকুমা তোমাকে মুড়ি ভেজে দিত ?" আকাশমণি হেসেই কুটোপাটি, "অ ঠাকুর্দা, দোলাই তো বাচ্চারা গায়ে দিত শুনেছি।"

"তা আমার মা যখন ধামিতে করে আমাকে মুড়ি খেতে দিত, তখন আমি তোদের মতো ছোট্টটি ছিলুমনি।"

"তাই বলো, তুমি তোমার মা'কে ঠাকুমা বলছ ? হিহিহিহি।"

হাসতে হাসতে আকাশমণি ঠাকুর্দার স্মৃতিভ্রংশের কথাটা চতুর্দিকে চাউর করতে যায়, আর ঠাকুর্দা ছাদের কোণটিতে ছেঁড়া বালাপোশ গায়ে দিয়ে, মাঘের রোদ্দুরের তাপে ঘুমিয়ে পড়েন।

শীতের সকালের ভারী মিঠে ঘুমটি। ঘুমোতে ঘুমোতে দাদুর ফোকলা মুখে হাসি ফোটে, ভারী মিষ্টি একটা স্বপ্ন দেখছেন আকাশমণির ঠাকুর্দা। একটা লোক, ভারী বিষণ্ণ কিন্তু দয়ালু-দয়ালু চোখ, তার দিকে চেয়ে চেয়ে বলছে, "আগেকার দিনগুলো খুব সুন্দর ছিল, না ?"

"তা ছেল বাবা, দ্যাখো না শীত বলতে তখন আমরা বুঝতুম খালি খাওয়া-দাওয়া। এমনিধারা জাড়ের কথা বাবা ভাবতেও পারতুম না। গোল হয়ে পায়রা উড়ত। গোবরার জমিদারের ছোট ছেলেটার তো কিচ্ছু হয়নি, খালি পায়রা ওড়াত, লক্কা, গেরোবাজ কত রকম, নামই কি ছাই জানি। তবে দেখতে লাগত খুব সুন্দর। গোল হয়ে চক্কর কেটে-কেটে উড়ছে সব। তোমাদের ঠাকুমা ঠিক সেই সময়টায় ছাদের ওপর পরিষ্কার কাপড় পেতে বড়ি দিত। বুড়ো-বুড়ি, মাথায় ধান-দুব্বো সিঁদুর। ধানিলঙ্কা হত বাগানে, এক-একটা যা ঝাল না ! গরম আদা-চায়ের সঙ্গে বেগুনি ভাজত মচমচে করে তোমাদের বউ-ঠাকরুন, পুজোর নৌমির দিনে পেঁয়াজ ছাড়া পেসাদি মাংসের কালিয়া কে কত খাবে, খাও না। কম্পিটিশন হত। বরাবর জিততুম আমরা বামুনপাড়ার দল।"

"শুধু খাওয়াদাওয়ার জন্যেই বাঁচতে ইচ্ছে করে, না দাদু।"

"তা যা বলেছ ভাই। তা জিনিসপত্রের যা দাম ! তা ছাড়া তেমন তিলের নাড়ু, চিঁড়ের মোয়া, এরা সব আর করতে পারে না। গোকুল-পিঠে...রসবড়া, মুখে দেবে আর মিলিয়ে যাবে।"

"এরা বলতে ?"

"এই বউমা'রা গো ! কী সব চিলি-মিলি-ঝিলি চিকেন রান্না করে। উৎকট গন্ধ। পাকা আরশুল্লোর তেল দিয়ে রাঁধে কিনা। ধনেপাতার কাঁড়ি দেবে মাছের মধ্যে। আমার মুখে রোচে নাকো। বলি একটু বড়ি-বেগুনি-কুমড়োর টক রাঁধো, কচুর শাক রাঁধো ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে, তা বলবে ও সবে বড্ড হাঙ্গামা বাবা, তার চেয়ে এই চাট্টি ফ্রায়েডরাইস করেছি, খেয়ে দেখুন। এতটুকুনি মিষ্টি নেই, বিদ্‌ঘুটে গন্ধ, সে খেলেই আমার গা উলটোয় বাবা।"

"তা আবার ছোলাভাজা, বাদামভাজা দিয়ে মুড়ি খাবার শখ আছে নাকি।"

"থাকলেই আর করছি কী দাদা, দাঁত নেই যে ?"

"দাঁত যদি আবার হয় ?"

"তো দেখি..."

"আবার গোল হয়ে পায়রা ওড়া দেখতে সাধ যায় নাকি ? তাও উড়ছে কিন্তু।"

"তা হবে বাবা...চোখে তো দেখি না..."

"চোখ যদি আবার হয় !"

আকাশমণির দাদু গভীর ঘুমে তলিয়ে যান।

সাউথ কেনসিংটন পার্কে একটা মেপল গাছের তলায় বেঞ্চিতে বসে ছিলেন মেরি ক্রোকার। বিকেল হয়ে এসেছে, লণ্ডনের ধূসর বিকেল। গাছপালাগুলো সব যেন সেই ছেয়েরং মেখে নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে। ঊনআশি বছর বয়স হয়েছে মেরি ক্রোকারের। তাঁর পরনে লাল টুকটুকে একটা পোলো-নেক হাত-ওলা সোয়েটার। নীল ওভার-অল। পাকা আমটির মতো চেহারা। পাকা চুলের গুছিগুলো যেন রুপোর সুতো দিয়ে তৈরি। তাঁর হাতের লম্বা চেনের উলটো দিকে গোল্ডেন রিট্রিভার কুকুর জেল চুপটি করে শুয়ে আছে। ও-ও বুড়ো হয়েছে। লোম আর আগের মতো সোনালি নেই। মোটা হয়ে গেছে। যদিও আপন ছেলের বাড়া যত্ন করেন তাকে মিসেস ক্রোকার। মনিব আর কুকুর দুজনেই খুব বিষণ্ণ। আসলে মেরি ক্রোকার আজ তাঁর ছেলে-বউ এবং দুই নাতি-নাতনিকে আশা করেছিলেন। নাতনিটির আবার সবে এনগেজমেন্ট হয়েছে। খুব ঝলমলে একটা আনন্দ-উল্লাসমুখর দিন কাটবে ভেবেছিলেন। নিজের হাতে অ্যাশপারাগাস স্যুপ, ফ্রেঞ্চ ফ্রায়েড প্রন আর পোট্যাটো, তা ছাড়া সসেজ ইন উর্স্টার সস্ রান্না করেছিলেন। সঙ্গে ছিল বাড়িতে বেক-করা রুটি, চিজ-স্ট্র, স্যালাড আর চমৎকার ডেসার্ট, নানারকম ফলের পায়েস। ঘণ্টাখানেক আগে ওরা ফোন করে জানাল, আসতে পারছে না। কেউ না। ড্যানি না, জ্যাকি না, ছেলে-বউ রোনাল্ড হেস্টার কেউ না।

গত তিন বছর একেবারে একা রয়েছেন মেরি । আসব-আসব করে ওদের আসা আর হয়েই ওঠে না । অথচ থাকে এমন কিছু একটা দূরে নয় । নাতি অবশ্য এডিনবরায় পড়াশুনো করছে, ওরা তিনজন থাকে উলভার-হ্যাম্পটনে । মেরি নিজে আজকাল যাওয়া-আসায় খুব একটা উৎসাহ পান না । কেমন দিশেহারা লাগে । শহর-বাজারের চেহারা নিত্য বদলাচ্ছে, নিয়ম-কানুন সবই । কুকুরটার দেখাশোনাই বা করে কে ! পার্কের পুব কোণে যে পুরনো ধাঁচের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, ওরই দোতলায় তাঁর দু'ঘরের অ্যাপার্টমেন্ট । জেল-ও খুব মনমরা হয়ে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে । ফোন বাজলেই ঘেউ-ঘেউ করে বেচারা ।

মনমরা অবস্থায় বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলে বুড়োমানুষদের তন্দ্রামতন এসে যায় । ঘোর এসে গিয়েছিল মেরি ক্রোকারের । হঠাৎ মনে হল, কে যেন তাঁকে আলতো করে ঠেলছে । ধড়মড় করে উঠে সামনে চেয়ে দেখেন, একটি ভারী মিষ্টি চেহারার লোক, সামনে দাঁড়িয়ে আছে । "ও দিদিমা, মেরি দিদিমা !"

প্রথমটা মেরি ক্রোকার ভেবেছিলেন, এ নিশ্চয়ই তাঁর হবু নাতজামাই জ্যাকির বন্ধু অ্যালফ্রেড । ওরা বলে অ্যাল্ । লোকটি বলল, "না, দিদিমা, আমার নাম ক্রিটো । আপনার খুব খারাপ লাগছে বুঝতে পেরে একটা সংস্থা আমাদের পাঠিয়েছে । একলা-একলা তো কোথাও যেতে ভয় পান, চলুন না আমাদের সংস্থার সঙ্গে ।"

মেরির ভয় হল । লোকটা নিশ্চয় ডাকাত-টাকাত হবে । পরক্ষণে ক্রিটো তাঁর হাতটা ধরবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা আনন্দ আর বিশ্বাসে ভরে গেল মনটা । মেরি বললেন, "তা, টাকা-পয়সা কী লাগবে ? কোথায়-কোথায় ঘুরব, বাছা ?"

ক্রিটো বলল, "টাকা-পয়সার কথা পরে হবে ।"

মেরি বললেন, "আমি ভাই বেশি হাঁটতে-টাটতে পারি না । হাঁটুতে অনেক দিনের আর্থারাইটিস ।"

"ঠিক আছে, ও সেরে যাবে ।" লোকটি খুব আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল ।

মেরি যাবার আগে শুধু বললেন, "জেল যাবে তো ?"

"নিশ্চয়ই ।"

অবতরণ

লে বললেন, "এস-এর বাড়ির পেছন দিকের ডোবাটার ওপর ল্যাণ্ড করো ।" হান বললেন, "পরে বুঝতে পারলে এরা কিন্তু আমাদের পেছনে লাগবে ।"

"শিফ্‌ট করতে হবে মাঝে-মাঝেই," লে জবাব দিলেন, "কিন্তু আপাতত এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও দেখছি না । আমাদের ফার্স্ট ব্যাচ রেডি । যত দেরি করব ততই তো ক্ষতি !"

শানু আজ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছিল, আকাশ থেকে একটা তারা হঠাৎ খসে পড়ল তাদের বাড়ির পেছনের ডোবায় । মশার ভ্যানভ্যানানি, ঝিঁঝির ডাক, ব্যাঙের ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ, সব হঠাৎ বন্ধ । তারাটা আস্তে-আস্তে বিরাট আকার নিচ্ছে । গোল একটা বলের মতো তাদের বাড়ির পেছনের মাঠের অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে তারাটা । শানুর ঘুম ভেঙে গেল । জানলার পাশে শিশুগাছটার ওপর কোথা থেকে একটা অদ্ভুত আলো পড়েছে । ডোবার পচা গন্ধটা আসছে না । শিশুগাছের ওপর আলোটা নিভে গেল । খালি একটা সরু আলোর রেখা জানলার বাইরে । পা টিপে টিপে দরজা খুলল শানু । ভেজিয়ে দিল । খিড়কির দরজা খুলল । ভেজিয়ে দিল । অন্ধকারের মধ্যে সরু একটা সাপের মতো হিলহিল করছে আলোর রেখাটা । একটু এগোতেই...যেখানে ডোবাটা ছিল সেইখানে..., তা হলে স্বপ্ন নয় ? নাকি সত্যি-স্বপ্ন ?

গোল বলের মতো বস্তুটাকে দেখবামাত্র শানু স্পষ্ট বুঝতে পারছিল এটা একটা উড়ন্ত চাকি, যাকে কাগজে বলে ইউফো । কাদের, সেটাই এখন বিবেচ্য, কেনই বা এখানে এসেছে ! বলটা এখন অন্ধকার । শুধু গা'টা চকচক করছে । মাঝখানে একটা গোল দাগ । সেখান থেকে আলো আসছে । লম্বা একটা সিঁড়ি নেমে এল সেখান থেকে, শানু এবার একটু ইতস্তত করল, তারপর সিঁড়ি বেয়ে সোজা টকটক উঠে গেল । গোল দাগটা আসলে এই উড়ন্ত চাকির দরজা ।

ঢুকতে প্রথমে ভেতরের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল । তারপর আলোটা আস্তে-আস্তে কমে চোখ সওয়া হয়ে এলে স্বপ্নে আবছা-দেখা মানুষটিকে সে সামনে দেখতে পেল । মাথায় সবুজ হেলমেট, গায়ে অদ্ভুত ধাতুর পোশাক । মানুষটির চোখ-মুখ খুব সুন্দর । কিন্তু বিষাদ-মাখা । বললেন, "আমি লে, আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করো শান্তনু ।"

ভেতরের কোণ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আরও পাঁচজন মানুষ । লে বললেন, "এ হল হান, এ ক্রিটো, ইনি কা, ইনি হলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, আর এই হলেন সর্বকনিষ্ঠ পাউ ।"

লে বললেন বটে, কিন্তু এঁদের মধ্যে কে যে বড় আর কে ছোট, ব্যাপারটা শানু ঠিক বুঝতে পারল না । কারও মুখেই বয়সের রেখা নেই, চামড়া ঝোলেনি, হেলমেট খুলে ফেলতে দেখল, মাথার চুল সব কালো কিংবা সোনালি । এঁরা কি

তার কাকার বয়সী, না মহীতোষদা-সারের ? না রিটায়ার্ড হেডমাস্টারমশাই জ্যোতির্ময়বাবুর ?

সে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কে ? আপনাদের যেন আমি আগে কোথায় দেখেছি !"

"দেখেছ ঠিকই," খুব সুন্দর করে হাসলেন লে ।

পাউ হাত বাড়িয়ে বললেন, "আমরা তোমার বন্ধু ।"

'বন্ধু' কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শানুর সমস্ত শরীরে যেন একটা শিহরণ খেলে গেল । চোদ্দ বছরের জীবনে শানু বন্ধু কাকে বলে জানে না । আর এই অসাধারণ এবং অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটি তার বন্ধু ! সমস্ত ভয়, সঙ্কোচ, সংশয় যেন মুহূর্তে লোপাট হয়ে গেল ।

"সত্যি ? কিন্তু আপনারা কে ?"

"আমরা ই-টু গ্রহের মানুষ । তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এসেছি ।"

"আমার সঙ্গে ?"

"শুধু তুমি নয়, আরও অনেকে আছেন," বলতে বলতে হান এগিয়ে গিয়ে ইউফোর মসৃণ দেওয়ালে একটি অদৃশ্য বোতাম টিপে দিলেন । দেওয়ালটা আলিবাবার গুহার মতো দু'দিকে সরে গেল । শানু দেখল, একটা নিচু গোল ঘর, ফিকে হলুদ । মাথার দিকে গোল-গোল স্বচ্ছ ভেনটিলেটরের মতো কতকগুলো গর্ত রয়েছে । কাচের মতো কিছু দিয়ে ঢাকা । ঘরটাতে তার সামনে মুখোমুখি নানান জাতের নানান চেহারার ছেলেমেয়ে, তারই মতো, বা তার থেকে সামান্য বড় হবে হয়তো । বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও দেখা গেল ।

পাউ বললেন, "এদের সবাইকার সঙ্গেই আমরা বন্ধুত্ব করেছি । আস্তে আস্তে সবাইকার নাম-টাম জানতে পারবে ।"

শান্তনু বলল, "কেন বন্ধুত্ব করলেন ?"

"তোমাদের সবারই এই বন্ধুত্ব দরকার ছিল, তাই ।"

"শুধু তাই ? আর কোনও কারণ নেই ?" শানু অবাক হয়ে পাউয়ের ঝাঁকড়া সোনালি-চুলে ভরা মাথাটার দিকে চাইল ।

লে-হান-ক্রিটো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন । তারপর সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ চি বললেন, "শোনো শান্তনু, তোমরাও সবাই শোনো । যদি বলতে পারতুম তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্যেই করেছি, তা হলে আমাদের চেয়ে খুশি কেউ হত না । কিন্তু ব্যাপারটা আসলে...আমাদেরও কিন্তু তোমাদের মতো বন্ধুর খু-উ-ব জরুরি দরকার । তোমাদের আমরা আমাদের সঙ্গে চাই । যাবে আমাদের সঙ্গে ?"

"কোথায় ?" এবার প্রায় সবাই একসঙ্গে বলে উঠল ।

পাউ বললেন, "আমাদের গ্রহ ই-টুতে । যাবে ?" পাউয়ের গলায়, চোখে অনুনয় ।

ওরা বলল, "কেমন জায়গা সেটা ?"

হান তাঁর কালো কোঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, "এই ই-ওয়ানেরই মতো, কিন্তু অপূর্ব সুন্দর । আসলে আমাদের গ্রহের প্রকৃতি, আবহাওয়া সব কিছুই এত পরিচ্ছন্ন যে, তোমরা ধারণা করতে পারবে না ।"

"অমন সুন্দর যদি আপনাদের দেশ, তো এত আলোকবর্ষ পেরিয়ে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এলেন কেন ?" চকচকে চোখে নীতা সিং প্রশ্ন করল ।

ছ'জনের মুখই একসঙ্গে মলিন হয়ে গেল ।

বিষণ্ণ চোখের সুন্দর, স্নেহময় মানুষ লে বললেন, "প্রশ্নটা তোমাদের কাছ থেকে আমাদের আশা করা উচিত ছিল ভাই নীতা । প্রশ্নটা তুমি ঠিকই করেছ । আমাদের একটা স্বার্থ আছে বইকী । যে স্বার্থের আভাস একটু আগে চি দিলেন । আমাদের গ্রহে সব আছে, অপরূপ সব নদী, মনমাতানো সবুজ ঘাসের মাঠ, পরিচ্ছন্ন অরণ্য, ছোট-ছোট সুন্দর কুটির, সমুদ্রতীরে ঝাউবনের কোল ঘেঁষে আকাশছোঁয়া প্রাসাদ । চারিদিক মাতাল করা সুবাস আমাদের ফুলের । সব আছে, শুধু মানুষ নেই ।"

"মানুষ নেই ? সে কী !"

"একেবারে নেই বলব না । মুষ্টিমেয় । গ্রহটা আয়তনে তোমাদের এই পৃথিবীর থেকে সামান্য ছোট । তা সেই সারা গ্রহে টিমটিম করছে মাত্র সাত হাজার তিনশো পঁয়ত্রিশটি মানুষ । কোনও বৃদ্ধ নেই, শিশু নেই, কিশোর নেই ।"

"তার মানে ?" হবিব বলল ।

"এটা কী করে সম্ভব ?" রিকার্ডো নামে একটি স্পেনীয় ছেলে জিজ্ঞেস করল ।

"কী করে ? প্রযুক্তিবিজ্ঞানে এগোতে এগোতে, ভাই রিকার্ডো, আমরা এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছিলুম, যখন যন্ত্র অর্থাৎ কম্পিউটার আর রোবট দিয়েই আমরা সব কাজ করাতে আরম্ভ করি । কয়েকশো বছর পর লক্ষ করা যায়, হঠাৎ আমাদের জনসংখ্যা ভীষণভাবে কমতে শুরু করেছে । নতুন মানুষ আর জন্মাচ্ছে না । তখন আমরা মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে শুরু করি । আমাদের হিউম্যান টেকনোলজির সাহায্যে জরাকে দাবিয়ে রাখি বছরের পর বছর । তারপর একদিন

এল যখন মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে মানুষ আর রাজি হল না। ই-টুর স্বার্থে যাঁরা রাজি হলেন, সেই সাত হাজার তিনশো পঁয়ত্রিশটি মানুষ এবং অসংখ্য রোবট এখন আমাদের গ্রহের বাসিন্দা। রোবটরাই কলকারখানা চালায়, শস্য উৎপাদন করে, বাজার নিয়ন্ত্রণ করে, সমস্ত হিসেবপত্র কম্পিউটারদের দখলে। আমরা মুষ্টিমেয় মানুষ শুধু তাদের চালাই, সারাই, পুরনো রোবট মেরামত করে নতুন রোবট গড়ি। আর প্রাণপণে চেষ্টা করি নতুন প্রাণ সৃষ্টি করতে। বহু চেষ্টার পর বুঝেছি, পারব না। তাই তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এসেছি। তোমরা, পৃথিবীর মানুষরা যদি আমাদের সুন্দর গ্রহে গিয়ে বসতি করো।"

আকাশমণির ঠাকুর্দা বললেন, "তা আমাদের মতো বুড়োমানুষদের তোমরা চাইছ কেন? আমরা তোমাদের কী কাজে লাগব ভাই?"

পাউ হেসে বললেন, "আপনারা? নতুন যেসব মানুষ জন্মাবে, তাদের গল্প বলবে কে? শীতের দিনে রোদে বসে রুপোলি চুল-দাড়ি নেড়ে দাদু-দিদিমা'রা গল্প বলছেন আর নাতি-নাতনিরা তা শুনছে হাঁ করে, এ দৃশ্য আমরা বইয়ের পাতাতেই দেখেছি। চোখে দেখিনি কখনও।"

ক্রিটো আমতা-আমতা করে বললেন, "পৃথিবীতে আপনারা সর্বত্রই খুব নিঃসঙ্গ দেখলুম। ই-টু'তে আপনাদের কোনও অসুবিধে হবে না। যেটুকু শারীরিক অসুবিধে ছিল, যেমন চোখে কম দেখা, কানে কম শোনা, কোমরে বা হাঁটুতে ব্যথা, সেগুলো তো আমরা সারিয়েই দিয়েছি। আপনাদের বৃদ্ধ-বয়সটুকু আমাদের গ্রহের সুন্দর আবহাওয়ায় আপনারা উপভোগ করবেন, কোনও দায় থাকবে না। কী, যাবেন?"

বুড়োবুড়িরা ভাবতে থাকেন, কেউ থাকেন বৃদ্ধাবাসে, কেউ একা অ্যাপার্টমেন্ট। কবে মরে পড়ে থাকবেন, কেউ জানতেও পারবে না। কেউ ভরা-ভর্তি সংসারের মাঝখানে একটা অকেজো বাসনের মতো। ওঁরা বললেন, "হ্যাঁ, আমরা যাব।"

কিশোর-কিশোরীরা ভাবল, তাদের একজনেরও সত্যিকার আপনজন বলতে কেউ নেই। কারও কাকা, কারও মামা, কারও কোনও হোম, কারও আবার শুধুই রাস্তা ভরসা। ওরা সমস্বরে বলে উঠল, "হ্যাঁ, যাব, আমরা যাব।"

লে'র মুখে সেই সুন্দর হাসিটা ফিরে এল। হান নিজের ভাষায় তাঁকে কী বললেন। ক্রিটো তাকালেন চি'র দিকে। কা এবং পাউ এগিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে দুটো বোতাম টিপে দিলেন।

গোটা ঘরময় মুহূর্তের মধ্যে নেমে এল নিঃসাড় ঘুম, আর আকাশযানে এল প্রবল গতি।

দ্বিতীয় পৃথিবী

নতুন গ্রহের মাটিতে পা দিয়ে প্রথমটা সবারই কম-বেশি অসুবিধে হয়েছিল। জাহাজের খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ল সবুজ সমুদ্র দুলছে। তার ওপর সূর্যাস্তের বেগুনি সোনালি গোলাপি আভা। সমুদ্রের পেছনে আকাশখানা কী নীল! সমুদ্রসৈকতে সাদা বালির ওপর কী একরকমের লম্বা-লম্বা গাছ হরেকরকম রং মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর-এক দিকে চোখ ফেরাতেই দেখা গেল, নানা রঙের এক বিশাল পর্বতশ্রেণী। কা বললেন, "সূর্যাস্তের রঙের জন্য নয়, এমনিতেই ওই পাহাড় অমনি রঙিন। ই-টুর মাঝখান দিয়ে মেরুদণ্ডের মতো চলে গেছে ওই পাহাড়—জোরা। নানান ধাতুর খনি ওই পাহাড়ি অঞ্চলে। আর কাছাকাছি মনে হলেও ও পাহাড় এখান থেকে অন্তত একশো পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। সমতল সবুজ মাঠ একখানা বিশাল সাটিন-চাদরের মতো বিছোনো রয়েছে পাহাড়ের গা পর্যন্ত। মাঠের মাঝে-মাঝে বড়-বড় রঙিন পাতার সেই অপূর্ব গাছ। গাছগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে দেখা যাচ্ছে গোল-গোল বাড়িঘর।

দৃশ্যটার দিকে সকলেই এমন মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে ছিল যে, কারও খেয়াল হয়নি পৃথিবীর মতো হলেও জায়গাটা ঠিক পৃথিবী নয়। নামতে গিয়ে মেরিদিদিমা তো টিপ্‌ করে পড়েই গেলেন। রিকার্ডো এসে তাঁর হাত ধরে তুলল। হাঁটুটা ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। নীরজ দৌড়ে এসে বলল, "এই রে, এক্ষুনি দিদিমা'কে টেট-ভ্যাক নিতে হবে।" কথাটা শুনতে পেয়ে কা হাসলেন। বললেন, "ভয় নেই নীরজ, আমাদের গ্রহে ওসব খারাপ ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস কিছু নেই। ওই ছড়ে-যাওয়া জায়গাটা আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যাবে, শুধু একটু ঘাস থেঁতো করে লাগিয়ে দাও, যাতে রক্তটা বন্ধ হয়ে যায়।" আফ্রিকান ছেলে সিজার তাড়াতাড়ি খানিকটা সেই অদ্ভুত সবুজ ঘাস থেঁতো করে মিসেস ক্রোকারের হাঁটুতে লাগিয়ে দিল।

কা বললেন, "আমাদের গ্রহে অভিকর্ষ আপনাদের তুলনায় খানিকটা কম।"

মিসেস ক্রোকার বললেন, "তা যাই বলো মেয়ে, জায়গাটা যে হালকা, সেটা তোমাদের আগে থেকেই বলা উচিত ছিল। আমাদের দেশের এয়ার-হোস্টেসরা সব সময়ে সব বিপদের কথা আগে থেকে বলে সাবধান করে দেয়।"

কা বললেন, "সত্যিই আমাদের ভীষণ ভুল হয়ে গিয়েছিল। আসলে দিদিমা, আপনারা যে সত্যি আমাদের দেশে এসেছেন, এতে আমরা এত অভিভূত হয়ে গেছি যে..."

হান হাসতে-হাসতে বললেন, “কা, তুমিও দেখছি আমতা-আমতা করছ। পৃথিবীর মানুষ আমাদের গ্রহের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের মধ্যে একটা সুন্দর পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে দেখছি।”

কা লাজুক হেসে বললেন, “ছেলেমেয়েরা, তোমরা মিনিট দশেক এই মাঠে স্কিপিং করার মতো একই তালে লাফাতে থাকো। দাদু-দিদিমারা, আপনারাও একটু পায়চারি করুন সমানতালে পা ফেলে। তা হলেই আপনাদের শরীর ব্যাপারটা ধরে নেবে, আর অসুবিধে হবে না।”

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা গেল, কাছেই একটা ছোটখাটো ফলবাগানে ছেলেমেয়েরা দৌড়োদৌড়ি করে খেলা করছে। লম্বা লম্বা লাফ দিয়ে গাছের একেবারে মাঝ-ডালে পৌঁছে যাওয়া যায়। আমের মতো দেখতে সোনালি রঙের একরকম ফল ফলেছে, রিকার্ডো আর সিজার, শান্তনু আর হবিব অনেকগুলো ছিড়ে-ছিড়ে নীচে ফেলে দিচ্ছিল, আর নীরজ, নীতা, পিঙ্কি সেগুলো লুফে নিচ্ছিল। কয়েকটা রোবট এই সময়ে হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসেছিল। লে'র ইঙ্গিতে থেমে গেল।

লে বললেন, “তোমরা যা-খুশি করো, যত খুশি এইসব ফল খাও। কেউ কিছু বলবে না।”

রোবটগুলির দিকে তাকিয়ে বললেন, “ওরা তোমাদের কোনও কাজে বাধা দেবে না, খালি বিপদ হলে দেখবে। ওদের বলে দিচ্ছি।” এরপর রোবটগুলো শুধু যান্ত্রিক মুখে ওদের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সব গোল হয়ে মাঠের একধারে বসে ছিলেন। মেরি ক্রেকারের পায়ের কাছে জেল! ছোট্ট একটা ঘাসের ডাঁটা তুলে নিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছিলেন আকাশমণির ঠাকুর্দা। দেবেশদাদু কান খোঁচাখুচির বিপদের কথা বলতে গম্ভীর ভাবে বললেন, “তখন ব্যাকটিরিয়ার কথা এরা কী সব বলছিল, তুমি বোধহয় ভাল করে শোনোনি দেবেশভায়া, এদের দেশে ওসব সেপটিক-ফিকের ভয় নেই। আমি গাঁয়ের মানুষ হয়েও কিন্তু খেয়াল করেছি কথাটা।”

কাশীঠাকুমা আরেক গাঁয়ের মানুষ। তিনি বললেন, “আমিও একটু সেফটিপিন দিয়ে দাঁত খুঁচিয়ে নিই তা হলে। সেই কবে পান খেয়েচি, সুপুরির কুচিটুকু এখনও দাঁতের গোড়ায় আটকে আছে।”

দেবেশদাদু চুপচাপ স্বভাবের মানুষ। ই-টুর আকাশে এই সময়ে একসঙ্গে দুটো চাঁদ উঠতে দেখে তিনি একেবারে ব্যোমভোলা হয়ে গেলেন। একটি রোবটকে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি লাজুক-লাজুক মুখে তাকে একটা কাগজ-কলম আনতে বললেন। আসলে কয়েকটা কবিতার লাইন ধাঁ করে তাঁর মাথায় এসে গিয়েছিল—

তেরেকেটে ধা
একেবারে দুটো চাঁদ ? বা !
গলা ছেড়ে তবে গান গা
সারেগামা, রেগামাপা, ধানিপাধাপা।

রোবটটা কিন্তু ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই রইল। দেখতে পেয়ে ক্রিটো তাড়াতাড়ি এসে ক্ষমা চাইলেন। রোবটটিকে দিয়ে দেবেশদাদুর ফরমাশমতো জিনিস আনিয়ে দিলেন। বললেন, “খুব দুঃখিত দাদু। এবার থেকে আপনাদের কাছে ট্রানস্লেটর ফিট করা রোবট থাকবে। তবে আপনাদের এই গ্রহের ভাষা শিখে নিতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। পাঁচ দিনের ক্র্যাশ কোর্স। কারণ কয়েকদিনের মধ্যেই হেড কোয়ার্টার্স থেকে আপনাদের স্বাগত জানাবার জন্য একটা পুরো দল আসছে। তাদের ইচ্ছে, ই-টু'র ভাষাতেই তারা আপনাদের সঙ্গে কথা বলবে।”

দেবেশদাদু বললেন, “বলো কী ভাই, পাঁচ দিনে একটা নতুন ভাষা ? এই বুড়ো মগজে ?”

ক্রিটো বললেন, “ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা ঠিক শিখিয়ে নেব। এখন চলুন রেস্ট-হাউসে, অনেক দূর থেকে এসেছেন, আপনাদের বিশ্রাম দরকার।”

দৌড়োদৌড়ি করে ততক্ষণে প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে ছেলেমেয়েদের। রেস্ট-হাউসের প্রথম ঘরখানায় ঢুকেই ওদের প্রত্যেককে একটা পাপোশ-মতো কী নরম বস্তুর ওপর দাঁড়াতে হল। ভিজে-ভিজে সুগন্ধ একটা হাওয়া ঝড়ের বেগে ওদের জামা-কাপড়, হাত-পা-মুখ সমস্ত পরিষ্কার করে দিয়ে চলে গেল। তারপর রোবটরা একে একে ওদের নাড়ি টিপে একটা করে বড়ি দিল। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, এক-একজন এক-একরকম বড়ি পেল। পাউ বললেন, “তোমাদের পাল্‌স্‌ দেখেই কার কী চাহিদা বুঝে ফেলেছে রোবটরা। বড়িগুলো খেয়ে নাও। দেখবে পেট ভরে যাবে। ক্লান্তি আর থাকবে না।”

বড়িগুলো খেতে খুব সুন্দর। খাবার সঙ্গে-সঙ্গে ওদের পেট ভরে গেল। খালি আকাশমণির দাদু খুঁতখুঁত করতে লাগলেন। “যাচ্চলে, তবে যে বলেছিলে ছোলাভাজা, বাদামভাজা দিয়ে মুড়ি মেখে দেবে ? বলি দাঁত হল, তার জোর

হল, ধার হল, পরখ করব না ?”

ক্রিটোর দিকে অপ্রস্তুত মুখে চাইলেন পাউ। ক্রিটো তাড়াতাড়ি বললেন, “আর্থ-টাইপ ফুড তৈরি করতে আমাদের সামান্য ক'দিন দেরি হবে। ওসব খাওয়া আমরা প্রায় হাজার বছর আগেই ছেড়ে দিয়েছি তো! যাই হোক, লাইব্রেরিতে ফর্মুলা খোঁজা হচ্ছে, কিছু দিনের মধ্যেই যা-যা চান সব পেয়ে যাবেন দাদু। বড়িটা খেতে ভাল না ?”

“আমলকী-আমলকী একটা সোয়াদ পেলুম বটে।”

মেরি ক্রোকার বললেন, “স্বাদ বুঝব কী করে বাবা, খেতে না খেতেই তো পেট ভরে গেল।”

মাঠে বসে তিনি সারাক্ষণ কাশীঠাকুমা'কে তাঁর সসেজ ইন উর্স্টার সস্ রাঁধবার প্রণালীটা শিখিয়ে দিচ্ছিলেন। সসেজে কাশীঠাকুমার প্রবল বিতৃষ্ণার কথা বুঝে ডেসার্ট রন্ধন-প্রণালী শেখাতে লাগলেন। পাউ একটি রোবটকে ইঙ্গিত করতেই সে কাছে এসে দাঁড়াল। তার ভেতরে ট্রানস্লেটর ফিট করা আছে। মেরি-দিদিমা'র রেসিপি সে যন্ত্রস্থ করে ফেলছে।

নতুন গ্রহের নতুন জীবন

হেড কোয়ার্টার্স থেকে নির্দেশ এসেছিল, একদিকে পাহাড় আর একদিকে লিয়া সাগর, এই দুইয়ের মাঝখানে এই অপূর্ব অঞ্চলে পৃথিবীর মানুষদের প্রত্যেককে একটা করে আলাদা আলাদা কুটির দেওয়া হোক। নামেই কুটির অবশ্য। তাতে শোবার ঘর, বসবার ঘর, বাথরুম, সুইমিং পুল, জিমন্যাসিয়াম, টেনিসকোর্ট, আরও নানা খেলার সরঞ্জাম তো থাকবেই, তা ছাড়া থাকবে হুকুম তামিল করবার জন্যে এবং খেলার সঙ্গী হবার জন্যে চারটে করে রোবট। কিন্তু একদিনের অভিজ্ঞতার পরেই ওরা ব্যবস্থাটা বাতিল করে দিল। কাশীঠাকুমা বললেন, “মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে দেখি, দু'দিক থেকে দুটো কলের মানুষ প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রয়েছে। কেন রে বাপু, আমি কি তোদের ফর্মুলা নাকি যে আমাকে মুখস্থ করবি।”

জংবাহাদুর বড্ড গোঁয়ার। ওর শখ হয় রোবটের সঙ্গে কুস্তি করবে, রোবটটা বারেবারেই ওকে ছেড়ে সরে যাচ্ছিল। তখন জংবাহাদুর রেগে গিয়ে তাকে আচ্ছা করে পিটেছে। এখন জংবাহাদুর আর তার রোবট, দু'জনেই হাসপাতালে।

মেরিদিদিমা'র একলা থাকা অভ্যাস আছে। কিন্তু তাঁর কুকুর জেলের আবার রোবট সহ্য হয় না।

এখন ওরা সবাই একটা বিশাল বাড়িতে একসঙ্গে থাকে। দু'জন দু'জন করে থাকে একটা ঘরে। ঘরে নো রোবট। এ গ্রহের ভাষা শেখা ওদের হয়ে গেছে। সে এক ভারী মজার ব্যাপার। প্রথম দিনই রাত্তিরে ওদের সবাইকে আলাদা-আলাদা বিছানায় শুইয়ে মৃদু নীল আলো জ্বালিয়ে, সুন্দর বাজনা বাজিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হল। সকালে উঠে দেখে ই-টু'র অদ্ভুত একাক্ষরী ভাষা ওরা বেশ বুঝতে পারছে। এখানকার স্কুল-যাওয়াও নাকি এইরকম। লে বললেন, “স্কুলের জন্য অনেক সময় পাওয়া যাবে, এখন তোমরা শুধু আমোদ-আহ্লাদ করো।”

এরই মধ্যে নীতা একদিন আবদার ধরল, “লে কাকু, আমি সাদা-লেস-দেওয়া নীল রঙের সিল্কের ম্যাকসি পরব। তাতে ছোট-ছোট কাঠবেড়ালির ছাপ থাকবে। ছাপগুলো যেন উঠে উঠে থাকে।”

লে প্রথমটা একটু বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা এক ধরনের নরম কাগজের পোশাক পরেন। প্রতিদিন পরবার পর সে পোশাক বাজে-কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে আবার নতুন পোশাক পরতে হয়। কিন্তু কাকু ডাকে তিনি এমনই মুগ্ধ যে, আকাশ থেকে চাঁদ দু'খানা পেড়ে আনতে বললেও বোধহয় রাজি হয়ে যেতেন। তক্ষুনি কাগজ-কাপড় তৈরির কলে ফরমাশ গেল, একজন চিত্রকর এলেন, নীতার সঙ্গে কথা বলে বুনে নিয়ে কাগজে এঁকে ফেললেন নকশাটা, তারপর কলের মধ্যে থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে এল নীতার ম্যাকসি। দেখে সবাই মুগ্ধ। নীতা সেই জামা পরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গী-সাথীরা তো তাকে ঘিরে ধরলই, কিছু কিছু রোবটও দেখা গেল ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছে।

লে বললেন, “ওঁদের স্বয়ংক্রিয় প্রোগ্রামিং পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে তো। তোমার জামাটা নতুন ধরনের জিনিস, তাই চোখের মধ্যে দিয়ে সোজা মেমারি ব্যাঙে চলে গেল নকশাটা। এরপর ই-টু'তে কেউ যদি এইরকম জামা পরতে চায়, আঁকা-জোকার আর দরকার হবে না। এইভাবেই তোমরা আমাদের গ্রহে একটু অদলবদল আনো।”

সুন্দরন প্রশ্ন করল, এখানে সবাই একরকমের জামা পরে কেন ?”

লে বললেন, “অনেক দিন আগেই আমরা বুঝতে পেরেছিলুম, মানুষে-মানুষে

ভেদাভেদ, ঝগড়া, এসব দূর করতে হলে তাদের জীবনযাত্রার ধরন, পোশাক-আশাক সব একরকম করে ফেলতে হবে। তাই আমরা এই উজ্জ্বল বাদামি আর গোলাপি রঙের পোশাক ব্যবহার করি। সব পুরুষ বাদামি। আর সব মেয়ে গোলাপি।"

নীতা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "আমি কিন্তু সিল্কের পোশাক চেয়েছিলুম। পরলে গায়ে কী সুন্দর মাখন-মাখন মতো লাগে।"

লে অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "সিল্ক, মানে আসল সিল্ক তৈরি করা আমরা প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ছেড়ে দিয়েছি। শুধু সিল্ক কেন, পোশাক তৈরির সব রকম আর্থ-টাইপ উপাদানই আমরা তৈরি করা বন্ধ করে দিয়েছি বহু বছর আগে। তার অনেক অসুবিধে।ধোয়াধুয়ি, সংরক্ষণ। জ্ঞান ছাড়া কিছুই আর তখন আমরা সংরক্ষণ করবার কথা ভাবতে পারতুম না। আর যা কিছু, সবই অল্প দিনের জন্য ব্যবহার করে ফেলে দিই।"

কাশীঠাকুমা বললেন, "রান্না করো না, কাপড় কাচো না, সেলাই-ফোঁড়াইয়ের দরকার হয় না; যেটুকু কাজ সব করবে যন্তর। তা হলে তোমরা করোটা কী?"

হান বললেন, "আমরা এখন হিউম্যান টেকনোলজি নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছি। কত যে শাখা এর। কীভাবে নানারকম রোগ দূর করা যায়। কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি করা যায়, বার্ধক্য জয় করা যায়, মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা যায়। কিন্তু নতুন মানুষ আমরা এখনও গড়তে পারিনি।"

ই-টু'র সবচেয়ে সুন্দর সমুদ্র লিয়াতে তখন জোয়ার এসেছে। ঢেউয়ের মাথায়-মাথায় নাচছে যমজ চাঁদ। হুহু করে হাওয়া দিচ্ছে। ফাঁকা পড়ে আছে ধবধবে সাদা বালুচর।

দেবেশদাদুর মনে পড়ল গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ফোর্ট উইলিয়মের কাছে গঙ্গার ধারে বসে বসে তিনি জাহাজ দেখতেন। এমনই সন্ধ্যায় পুরীর সমুদ্রসৈকতে ভেঙে পড়েছে শহরের লোক। ব্রাইটনের সি-বিচের ঝলমলে দৃশ্যের কথা মনে পড়ল মেরি ক্রোকারের।

নিশ্বাস ফেলে হান বললেন, "আপনারা আমাদের সাহায্য করুন সেই পরিবেশ তৈরি করতে, যেখানে মানুষ জন্মানো সম্ভব।"

কাশীঠাকুমা বললেন, "তা যদি বলো হান ভাই, আমাদের তেরো নম্বরের গলিতে চ্যাঁ ভ্যাঁ লেগেই থাকত। আর মানুষগুলোর যত ভাব, তত ঝগড়া। কল নিয়ে ঝগড়া, রোয়াক নিয়ে ঝগড়া, রাস্তা নিয়ে ঝগড়া, আবার দেখো, এর অসুখে ডাক্তার-বাড়ি যাচ্ছেও। তাই বলি, হান ভাই, তোমাদের এতটা বাপু ভাল হয়নি। রাজ্যিশুদ্ধু লোক খাবে না, দাবে না, ভাল ভাল জামাকাপড় পরবে না। সিনেমা-থিয়েটার দেখবে না। খালি কি তোমার ছাই টেকলজি আর টেকলজি! এই সব নীতা, শানু, রিকার্ডো দাদু-দিদিরা না থাকলে যাই বলো বাপু আমাদের বড্ড একা একা লাগত। খালি কল আর কল।"

হান বললেন, "আপনারা চাইলে আমরা উন্নত ধরনের নাতি-রোবট তৈরি করে দিতে পারি। দেখলে বুঝতেই পারবেন না চট করে যে, মানুষ নয়। তারা আপনাদের কাছে আবদার করবে, চশমা লুকিয়ে রেখে মজা করবে, বই পড়ে শোনাবে।"

চি বললেন, "আপনারা কিছুদিন থাকলেই আপনাদের চাহিদাগুলো আমরা বুঝে যাব, প্রয়োজনমতো জিনিসগুলো তৈরি করে দিতে কোনও অসুবিধে হবে না।"

কাশীঠাকুমা বললেন, "তা হলে বাপু আমায় একটা ঝগড়া করা কল করে দিও। এতো চুপচাপের মধ্যে ঘুম আসে না নইলে।"

চি বিপন্ন মুখে বললেন, "ওটা করতে একটু অসুবিধে আছে ঠাকুমা। রোবটরা ভীষণ চট করে সব শিখে নেয় তো? যদি ঝগড়া করতে শিখে যায় তো আমাদের খুব মুশকিল হতে পারে। এ গ্রহে আমরা তো সংখ্যালঘু।"

কাশীঠাকুমা বললেন, "তবে তো মুশকিল! মুখটা যে আমার একেক সময় সুলসুল করতে থাকে ভাই। আমাদের গলিতে ঝগড়া লাগলে দু'একটা পাঁচফোড়ন ছেড়ে উশকুনি যে দিতুম না, তা তো বলতে পারছি না ভাই। রগড় ভারী জমত।"

নীরজ বলল, "আমাদের আরও অনেক-অনেক বন্ধু এনে দাও হানকাকু। আমরা গল্পের বই পড়ব, গোলগাপ্পা খাব, গরবা নাচব কাচ বসানো ঘাগরা পরে।"

রিকার্ডো বলল, "ক্রিসমাস করব আমরা।"

সুন্দরন বলল, "বাজি পোড়াব।"

হবিব বলল, "ঈদের ভোজ খাব নতুন জামা পরে, মাথায় নতুন ফেজ লাগিয়ে।"

লিয়ার ঢেউয়ে চাঁদের নাচন আস্তে আস্তে থেমে গেল। অন্ধকার প্রথমে ঘন হয়ে উঠে পরপর একটা ফিকে নীল আলোয় ভরে গেল চারদিক। পরক্ষণেই পরিষ্কার সাদা আলোয় শান্তনু দেখল, হলুদ রঙের গোল ঘরটায় নানারকম আসনে ছড়িয়ে বসে আছে তারা, ডজন-কয়েক ছেলেমেয়ে আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা।

সামনে দাঁড়িয়ে লে, পেছনে তাঁর বন্ধুরা।

সবাইকার মুখে বিস্ময়ের ছাপ দেখে লে একটু হেসে বললেন, "আমাদের গ্রহ ই-টু'তে জীবন কীরকম তোমাদের দেখানো হল।"

"তার মানে ?"

"তার মানে সেখানে এখনও আমরা যাইনি। তোমাদের সম্মোহিত করে সেখানকার জীবনযাত্রার যে ছাপ আমাদের স্মৃতিতে আছে, সেটাই তোমাদের মস্তিষ্কে প্রজেক্ট করেছি। এবং তোমাদের প্রতিক্রিয়াগুলো লক্ষ করেছি।"

"কেন ? কেন ?" দারুণ অবাক হয়ে সবাই জিজ্ঞেস করল।

হান বললেন, "বহু আলোকবর্ষ দূরের এই গ্রহে যেতে হলে আগে তোমাদের একরকম ক্যাপসুলে ঢোকাতে হবে, ঘুম পাড়িয়ে। আমরাও ঢুকব। আমাদের কারও কোনওরকম জীবনের লক্ষণ থাকবে না তখন। তারপর কম্পিউটার-চালিত এই জাহাজ এখন ই-টু'তে পৌঁছবে, আপনা-আপনি ক্যাপসুলের ভেতরের ট্রে বাইরে বেরিয়ে আসবে, আমরা সবাই জেগে যাব। এত সব কাণ্ড করে সেখানে পৌঁছবার পর যদি তোমাদের ভাল না লাগে, মন না বসে, ফিরে আসতে চাও, তা হলে কিন্তু আমরা মুশকিলে পড়ব। কারণ যাওয়া-আসার এতটা সময় তোমাদের জীবন ক্যাপসুলে মধ্যে থেমে থাকলেও এই পৃথিবীর সময় তো বদলে যাবে ; পরিচিত মানুষজন আর থাকবে না। কাজেই, আগে থেকে সব জেনে-শুনে যাওয়াই ভাল।"

একটু ইতস্তত করে চি বললেন, "যাতে পৃথিবীর কোনও ক্ষতি না হয় তাই আমরা এমন কয়েকজনকে বেছে নিয়েছিলুম, যাদের এই পৃথিবী ব্যবহার করতেই পারল না। তোমাদের অসুখ আমরা সারিয়ে দিয়েছি। মস্তিষ্ক আমাদের গ্রহের উপযুক্ত করে নিয়েছি। দাদু-দিদিমা, আপনাদেরও যেসব সামান্য বার্ধক্যজনিত উপসর্গ ছিল, তা আমরা সারিয়ে দিয়েছি। এখন শুধু আপনারা অনুমতি করলেই আমাদের যাত্রা শুরু করব।"

পাউ বললেন, "আপনাদের পছন্দমতো খাবার-দাবার, জামা-কাপড়, সিনেমা-থিয়েটার, গান-বাজনা ইত্যাদির অর্ডার আমরা ই-টু'তে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখানে এখন সিল্কের জন্য গুটিপোকার চাষ আর নানারকম আর্থ-টাইপ সবজির ও শস্যের জন্য জমি তৈরি বোধহয় শুরু হয়ে গেছে।"

বৃদ্ধ দেবেশদাদু বললেন, "তোমাদের ই-টু গ্রহটি ভাই অপূর্ব সুন্দর। কিন্তু যতই চাষবাস নতুন করে শুরু করো, তোমাদের জীবনযাত্রার একঘেয়েমি কাটতে বহু দিন লেগে যাবে। তবে আমি জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছি। অনেক ঝামেলাও সহ্য করেছি। এখন একটু শান্তি চাই। তোমাদের আকাশে দু'খানা চাঁদ আমায় বড়ই মুগ্ধ করেছে। তোমাদের কোনও উপকারে আসব না। শুধু বসে বসে কবিতা লিখব আর তোমাদের চলন্ত ফুটপাথে আর উড়ন-চাকতিতে সারা গ্রহটা ঘুরব। এই যদি হয় তো আমি যেতে পারি।"

লে উৎসাহিত হয়ে বললেন, "এই তো চাই। আপনি আমাদের ই-টু'তে নতুন করে কাব্য নিয়ে আসবেন, বিজ্ঞানের উন্নতি করতে যা আমরা হাজার বছর পেছনে ফেলে এসেছি।"

শান্তনু আকাশযানের ভেন্টিলেটরের মতো স্বচ্ছ গোল অংশটুকুর দিকে তাকিয়ে ছিল। সেখানে একটা নারকেল গাছের মস্ত ঝাঁকড়া-পাতা আড় হয়ে পড়েছে। মনে হল যেন কত-কতদিন পর নারকেল গাছ দেখল সে। পেছনটা থেকে অনেকক্ষণ থেকেই সোনালি আভা বেরোচ্ছিল। এখন বোঝা গেল কেন। প্রথম পৃথিবীর বিশাল একখানা মাত্র চাঁদ সোনালি রঙের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে উদিত হচ্ছে।

"শান্তনু, তোমার কী মত বলো।" লে'র ডাকে তার সম্বিত ফিরল।

শান্তনু আস্তে আস্তে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, দু'হাত জোড় করে ধরল, যেন কোনও দেবতাকে নমস্কার জানাচ্ছে, তারপর বলল, "মহামান্য লে, আপনি ও আপনার বন্ধুরা আমার অশেষ কৃতজ্ঞতার কথা জানুন। আপনাদের গ্রহ যেমন সুন্দর, তেমনই সরল, স্বচ্ছন্দ সেখানকার জীবনযাত্রা। আপনারা যে আমাদের বন্ধু করে সেখানে নিয়ে যাননি, অশেষ কষ্ট স্বীকার করে আমাদের দুরারোগ্য অসুখ সারিয়েও, আমাদের ওপর কোনরকম দাবি না করে, সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে দিয়ে আমাদের মতামত নিচ্ছেন, এর থেকে বুঝতে পারছি আপনারা কত ভাল, কত মহানুভব ! কিন্তু আমাদের এই প্রথম-পৃথিবী আমাদের বড় প্রিয়। আপনাদের দেওয়া নতুন জীবন, নতুন ক্ষমতা যদি এই পৃথিবীর সেবার জন্য ব্যবহার করি, আপনারা কি আপত্তি করবেন ?"

লে'র মুখে আস্তে আস্তে ছায়া নেমে আসছিল, হান বললেন, "কিন্তু শান্তনু, তোমার তো এ-পৃথিবীতে আপন কেউ নেই, কেউ তোমাকে ভালবাসেনি, সারা জীবন পদে পদে এই গ্রহে তোমায় ঠোক্কর খেতে হবে, কষ্ট পেতে হবে, তোমার মহামূল্য জীবন, প্রতিভা, সব বাজে কাজে নষ্ট হয়ে যাবে।"

শান্তনু বলল, "আমার মা-বাবা, ভাইবোন নেই ঠিকই। আপনাদের দ্বিতীয় পৃথিবীতে তাঁদের পেলে হয়তো আমি যেতে দ্বিধা করতুম না। কিন্তু এই পৃথিবীতে একদিন তাঁরা ছিলেন। এখানেই আমি জন্মেছি, এই গ্রহই এখন আমার

কাছে আমার মায়ের মতো। সারা জীবন এখানেই অনেক মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হবে, তাঁদের জন্য কিছু করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। যদি অনুমতি দেন তো আমি এখানেই থেকে যেতে চাই।"

অন্য ছেলেমেয়েরাও সমস্বরে বলল, "আমরাও এই পৃথিবীতেই থাকতে চাই, শান্তনুর মতো, যদি আপনারা অনুমতি দেন।"

লে বললেন, "আমাদের অনুমতির কোনও প্রশ্নই উঠছে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্যে আমরা আসিনি। তা হলে এখন দাদু-দিদিমা'রা, আপনারা কী করবেন ?"

মিসেস মেরি ক্রোকার সবার হয়ে বললেন, "বয়স তো অনেক হল। সময় হয়েই এসেছে। কিছু মনে কোরো না বাবারা। বিদেশ-বিভুঁয়ে আর মরি কেন ?"

ফ্রা-হাই-ফ্রা

আজ একটু বেলা করেই ঘুমটা ভেঙেছে। ঘুম ভেঙে প্রথমেই চোখ পড়ল শিশুগাছটার দিকে। শানু দৌড়ে গিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। ডোবাটায় একফোঁটা জল নেই। তলাটায় কাদা শুকিয়ে আছে। কিনারে ঝলসে আছে ঘাস-পাতা। কীট-পতঙ্গ। তা হলে সত্যিই ওরা এসেছিল ? ব্যাপারটা উদ্ভট, আজগুবি স্বপ্ন নয় ? হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই শানু তড়াক করে লাফিয়ে শূন্যে ডিগবাজি খেল চারটে। তারপর আলতো করে মেঝের ওপর নামল। একবার মনে করবার চেষ্টা করল আগাগোড়া ভারতবর্ষের ইতিহাস, পৃথিবীর ভূগোল। এতদিন বিজ্ঞান আর গণিত সম্পর্কে যা শিখেছে, সব। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে। ওরা কিছুই ফিরিয়ে নেয়নি। বিনিময়ে কিছুই দেওয়া হল না ওদের। শান্তনুর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অনেক চেষ্টা করেও ই-টু'র সেই অদ্ভুত একাক্ষরী ভাষার সব কিছু মনে করতে পারল না সে। রা-পিক-সান-ফ্রা-জো-কি—ভাল থাকো, এগিয়ে চলো, ধন্যবাদ, সামনে সুন্দর ভবিষ্যৎ, সংশয় রেখো না, নতুন শিশুর মুখ দেখবে। আকাশের দিকে মুখ করে সে বলল, "সান-হাই-সান। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।" তারপরেই লাফিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। অনেক কাজ এখন, অনেক কাজ। নীতা, সুন্দরন, জংবাহাদুর, রিকার্ডো, ওরা সব কোথায় কে জানে। কিন্তু সব্বাইকে খুঁজে বার করতে হবে। যোগাযোগ রেখে চলতে হবে। আর একটু বড় হয়ে নিয়েই পৃথিবীজোড়া একটা প্রতিষ্ঠান গড়বে তারা। সমস্ত পৃথিবীর ভাল-মন্দ-উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখা হবে তার কাজ। একটিমাত্র চাঁদ-ওয়ালা রাসায়নিক ধুলোর মেঘে ঢাকা গরিব পৃথিবী তাদের। ফ্রা-হাই-ফ্রা। সুন্দর ভবিষ্যৎ, সামনে সুন্দর ভবিষ্যৎ !"

বিষণ্ণ বিদায়

আকাশযানটিকে পৃথিবীর আবহমণ্ডলের বাইরে নিয়ে যেতে যেতে ই-টু'র প্রধান এঞ্জিনিয়ার হান, চিফ হিউম্যান টেকনোলজিস্ট লে'র বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমাদের ভুলটা কোথায় হল লে ?"

লে অন্যমনস্ক গলায় বললেন, "কোথায় ?"

"আমরা ওদের বুদ্ধি, স্মৃতি, শরীর নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলুম, আবেগ, আসক্তি, ভালবাসা-সমেত হৃদয়টার কথা ভাবিনি। সার্জারির পরিধিটা আরও একটু বাড়িয়ে নিলেই আর এই সমস্যাটা হত না।"

লে বললেন, "বলছ কী হান ? তা হলে তো আমাদের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হত। আমরা কি হৃদয়ের খোঁজেই ই-ওয়ানে আসিনি ? যে-হৃদয়ের অভাবই আমাদের গ্রহের সমস্যা ? আর চাইলেই কি আমরা ওদের হৃদয়বৃত্তির ওপর সার্জারি করতে পারতুম ?"

ক্রিটো এবং পাউ, চি ও কা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। বাইরে থেকে যে-রকমই দেখাক না কেন, কেউ তিনশো, কেউ চারশো বছরের বৃদ্ধ তাঁরা। বহুবার মরে বেঁচে আছেন, জানতে হবে, আরও জানতে হবে, শুধুমাত্র এই তাগিদে। হিংসা নেই, বিদ্বেষ জয় করেছেন, প্রতিযোগিতার গ্লানি নেই, কিন্তু সেই পরম উষ্ণ অনুভব, যার নাম হৃদয়াবেগ, তা তাঁদের জীবন থেকে, তাঁদের গ্রহ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে বহুদিন। লে ঠিকই বলেছেন।

বিষণ্ণ মুখে ছয় অভিযাত্রী ক্যাপসুলে বন্দী হবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কম্পিউটার-চালিত এই মহাকাশযান যখন তাঁদের নিয়ে ই-টু'তে পৌঁছবে, তখন সেখানে মানুষের সংখ্যা কমে ঠিক কত দাঁড়াবে, কে জানে !